জীবনের কোন সুদৃঢ় বন্ধনই গ্রাহ্য করে না এবং পার্থিব অন্য কোন চিন্তাকেই প্রধান বলিয়া মনে করে না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ফিলিপ্স্ সাহেব কোন নিহিলিষ্ট পরিবারের একটি গল্প লিখিয়াছেন।

আইভান্ আইভ্যানোভিচ্ এবং পল পেট্রোল্‌স্কি নামক দুই বন্ধুকে উদ্যমশীল নিহিলিষ্টদিগের আদর্শরূপে ধরা যাইতে পারে। একটি দিনের জন্য সামান্য মনোমালিন্যও তাঁহাদের দীর্ঘ বিশবৎসরব্যাপী সুদৃঢ় বন্ধুতার মধ্যে প্রবেশ করিতে অবসর পায় নাই, কিন্তু তথাপি উদ্দেশ্যসাধনের জন্য প্রয়োজন হইলে একজন অপরের বক্ষে ছুরি চালাইতে সঙ্কুচিত হইতেন না।

আইভ্যানোভিচ্ বিপত্নীক, তাঁহার একটি পুত্র ও একটি কন্যা। পুত্রটির বয়স ২১ বৎসর, নাম সার্জ্জ, কন্যাটির বয়স ১৯ বৎসর, নাম ওল্‌গা; ওল্‌গার জন্মের অতি অল্পকাল পরেই শিশুদ্বয় মাতৃহীন হয়। কিন্তু পিতার স্নেহাতিশয্যে তাহারা কোন দিন মাতার অভাব বুঝিতে পারে নাই।

পেট্রোল্‌স্কি কখনো বিবাহ করেন নাই। প্রথম যৌবনে এক নিরাশ প্রণয়ের দুর্ঘটনার জন্য তিনি চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করেন; এবং বন্ধু আইভ্যানোভিচের পুত্রকন্যার প্রতি হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ ঢালিয়া দিয়া তাঁহাদেরই সহিত একত্র বাস করিতে থাকেন।

এই চারিজনের পরস্পরের মধ্যে যে প্রীতির বন্ধন ছিল এরূপ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা যেন তাঁহাদের কল্পনাপ্রসূত এক স্বতন্ত্র পৃথিবীতে বাস করিতেন। সার্জ্জ ও ওল্‌গা পরস্পরের উপর এতই নির্ভর করিত যে, তাহারা তাহাদের সমবয়স্কদিগের সহিত বন্ধুতা স্থাপনের জন্য কিছুমাত্র

ব্যস্ত ছিল না। ওল্‌গার কমনীয় কান্তি ও রূপমাধুর্য্য দেখিয়া কতিপয় যুবক তাহার অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু তাহার প্রতিজ্ঞা, সে তাহার দাদার ন্যায় মহৎহৃদয়, নিঃস্বার্থপর, সুপুরুষ ভিন্ন অন্য কাহাকেও বিবাহ করিবে না। সার্জ্জের সংকল্প, যদি সে তাহার ছোট ভগিনীটির মত একটি স্নেহশীলা সুন্দরী বালিকা পায় তবেই বিবাহ করিবে, নতুবা নহে।

একদিন কোন কার্য্যোপলক্ষ্যে পেট্রোল্‌স্কি প্যারিসে গিয়াছিলেন। যে রাত্রে সে পারিস হইতে প্রত্যাগমন করেন সেই রাত্রে তাঁহার ভয়ানক শিরোবেদনা উপস্থিত হয়; কিছু আহার না করিয়া তিনি রাত্রি নয়টার সময় শয়ন করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহাকে অত্যন্ত অসুস্থ দেখা গেল; ডাক্তার আসিয়া তাঁহার শরীরে টাইফইড্ জ্বরের লক্ষণ দেখিতে পাইলেন। তাঁহার সুচিকিৎসার জন্য যথাসম্ভব উপায় অবলম্বিত হইল, সেবাশুশ্রূষারও ত্রুটি হইল না,—কিন্তু ক্রমেই তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দশম দিনে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি আইভ্যানোভিচ্‌কে কতকগুলি কাগজপূর্ণ গালামোহর করা একখানি লেফাপা প্রদান করিলেন, আইভ্যানোভিচ্ সাবধানে তাহা পকেটবহির ভিতর রাখিলেন। ওল্‌গা ও সার্জ্জ পিতৃবন্ধুর রোগশয্যাপ্রান্তে দাঁড়াইয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিল, পেট্রোল্‌স্কি তাহাদের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক মৃদু অথচ স্পষ্টোচ্চারিত স্বরে বলিলেন, "তোমরা দেখিয়াছ আমি আমার কার্য্যভার তোমাদের পিতার হস্তে সমর্পণ করিলাম, তিনিও তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।"

ভ্রাতা এবং ভগিনী সমস্বরে উত্তর করিল "দেখিয়াছি"।

পেট্রোল্স্কির মৃতদেহ সমাধিস্থ হইবার পূর্ব্বেই আইভ্যানো-ভিচের শরীরেও সেই সংক্রামক জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। ডাক্তার ওল্গা ও সার্জ্জকে তাহাদের পিতার গৃহকক্ষে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু তাহারা সে নিষেধ পালন করিতে সম্মত হইল না। আইভ্যানোভিচ্ পুত্রকন্যাকে নিকটে ডাকাইয়া তাহাদের প্রতি কোন গোপনীয় আদেশ প্রদান করিলেন, এবং তাহা প্রতিপালনের জন্য শপথ করিতে বলিলেন।

অনন্তর তিনি অধীরভাবে বলিলেন, "আর একটি দিনও নষ্ট করা যাইতে পারে না; আমি পীড়িত না হইলে এতক্ষণ সেণ্ট-পিটারস্বর্গে যাত্রা করিতাম। সার্জ্জ, তুমি অদূরদর্শী, বালক মাত্র; কিন্তু আমার উপদেশ প্রতিবর্ণে পালন করিলে তোমার পদে কুশাঙ্কুরও বিদ্ধ হইবে না।"

কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন তাঁহাকে অসহায় অবস্থায় এই রোগশয্যার পরিত্যাগ করিয়া যাইতে শোকদুঃখে তাহার পুত্র-কন্যার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, যখন তাঁহার মনে হইল সাম্প্র-দায়িক উদ্দেশ্যসাধনপথে এই তাহাদের প্রথম পদক্ষেপ, তখন তিনি সার্জ্জকে মধ্যে মধ্যে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া কেন কায শিখান নাই, শিখাইলে সে তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিত ভাবিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন। যদিও পুত্রকন্যার প্রতি স্নেহে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইতেছিল, তথাপি তিনি কঠোরস্বরে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা ভয় পাইতেছ?"

সার্জ্জ মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত হইল। পিতার কথা শুনিয়া সহসা তাহার চক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সঞ্চার হইল। সে উত্তর করিল, "মৃত্যুভয়ে আমি কাতর নহি, কিন্তু পিতঃ, তোমার

এবং ওল্‌গার জন্যই আমার এ কাতরতা। হায়, অভাগিনী ওল্‌গা! সে কি তোমার নিকট থাকিতে পাইবে না?"

আইভ্যানোভিচ্ কন্যার দিকে চাহিলেন। গভীর দুঃখে বালিকার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু শীঘ্রই তাহার সর্ব্ব-শরীরে দৃঢ়তার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। পিতার তীক্ষ্ণদৃষ্টির সম্মুখে সে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না।

পিতা বলিলেন, "পরাজয়ের অর্থ অপমান; তোমাদের কার্য্য সফল করা চাই। সার্জ্জ, ওল্‌গার উপস্থিত বুদ্ধি তোমার অপেক্ষা অধিক। তোমার একাগ্রতা এবং সাহসে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু তোমাদের উপর যে কার্য্যভার প্রদত্ত হইতেছে তাহাতে সতর্কতার অত্যন্ত প্রয়োজন। তোমার প্রকৃতিতে উগ্রতা এবং দুঃসাহসের পরিচয় পাওয়া যায়।"

আইভ্যানোভিচ্ ক্ষণকালের জন্য নীরব হইলেন। তাহার পর ওল্‌গার সুকোমল কর আপনার উভয় হস্তের মধ্যে লইয়া মৃদুহাস্যে সস্নেহে বলিলেন, "মা, তুমিও যাও; যদি তোমরা সতর্কতার সহিত কার্য্য শেষ করিতে পার, তিন সপ্তাহের মধ্যে আমার নিকট ফিরিয়া আসিতে পারিবে; আমার পুত্রকন্যা হইতে আমার মুখ উজ্জ্বল হইবে।"

* * * * *

উল্লিখিত ঘটনার এক সপ্তাহ পরে সমগ্র য়ুরোপ স্তম্ভিতহৃদয়ে শ্রবণ করিল, নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রবল শত্রু, রুষ সম্রাটের বিশ্বস্তবন্ধু এবং অনুরক্ত কর্ম্মচারী জেনারাল ব্যালানিকফ্ সেণ্ট-পিটার্‌স্‌বর্গের রাজপথে নিহত হইয়াছেন। তিনি যখন রাজ-প্রাসাদে যাইতেছিলেন সেই সময়ে তাঁহার ক্রহাম-স্থিত বাক্সের ভিতর সংগোপনে রক্ষিত ডিনামাইটপূর্ণ একটি ক্ষুদ্র আবরণ

বিস্ফূরিত হইয়া তাঁহাকে চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে; এবং তাঁহার কোচ্ম্যান ও একটি অশ্ব তৎক্ষণাৎ নিহত হইয়াছে।

বলা বাহুল্য পুলিশ অপরাধীকে ধৃত করিবার জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতে লাগিল; জেনারাল সাহেবের বন্ধুবর্গও নিশ্চেষ্ট রহিলেন না।

যে সকল লোক ধৃত হইল, তাহাদের মধ্যে দুইটি অর্দ্ধবয়স্ক যুবকের প্রতি অনেকের সন্দেহ হইয়াছিল; এই উভয়ের একজন ছদ্মবেশিনী রমণী। উভয়েই অবিচলিতচিত্তে কঠোর নির্য্যাতন সহ্য করিতে লাগিল। ক্রমে উৎপীড়ন অসহনীয় হইয়া উঠিলে যুবক কর্ত্তৃপক্ষীয়গণকে জানাইল যে, "তাহার সঙ্গী তাহারই ভগিনী; যদি তাহার ভগিনীকে অব্যাহতি দেওয়া হয় তবে সে দোষ স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছে; তাহার ভগিনী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী।"

কর্ম্মচারীগণ যুবকের প্রার্থনা রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

সেনাপতি ব্যালানিকফ্‌কে নিহত করিবার জন্য কিরূপ উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল যুবক তাহা বিবৃত করিল। রুষীয় ব্যবস্থামতে ভ্রাতাভগিনী উভয়েরই প্রাণদণ্ড হইল।

আইভ্যানোভিচ্ যখন এই সংবাদ শুনিলেন তখন তিনি আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার মুখ মলিন হইয়া গেল, ক্ষণকালের নিমিত্ত তিনি শোকাভিভূত হইলেন; কিন্তু তখনই উঠিয়া বসিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীবর্গকে একখানি পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, তাঁহাদের আদেশ নির্ব্বিঘ্নে পালনের পক্ষে যে যৎকিঞ্চিৎ বাধা উপস্থিত হইয়াছিল সে জন্য যেন তাঁহাকে ক্ষমা করা হয়।

---

# সাংখ্যদর্শন।

## ॥ ২০ ॥ সাংখ্যদর্শনে "শ্রুতি" প্রমাণ কি না ?

শুনিতে পাই * এই প্রবন্ধমালায় সাংখ্যদর্শনের যেরূপ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইতেছে তাহা সাংখ্যমতের বিরুদ্ধ বলিয়া কেহ কেহ সন্দেহ করেন। সন্দেহকারীগণ যদি সন্দেহের কারণ প্রকাশ করেন, তাঁহাদের নিকট বিশেষ বাধিত হইব ; এবং নিজের ভ্রম বুঝিলে তাহা অকপট হৃদয়ে অঙ্গীকার করিব।

যৎকালে বিদ্যালয়ে প্রথম সাংখ্যদর্শন পাঠ আরম্ভ করি তৎকালে ইহা নিতান্ত অন্ধকারময় বলিয়া বোধ হইত। অধ্যাপকগণকে জিজ্ঞাসা করিলে অনেক কথার সদুত্তর পাইতাম না। সূত্রগুলির রচনা চমৎকার হইলেও তাহা বড়ই অস্পষ্ট বলিয়া বোধ হইত। ভাষ্যকারদের ভাষ্যে অস্পষ্টতা দূরীভূত হওয়া দূরে থাকুক্—তাহা পাঠে অনেকস্থলে বেদের "তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে"—এই বাক্য স্মরণ হইত।

বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর স্বাধীন অধ্যয়ন ও চিন্তার সাহায্যে যেন অন্ধকারের মধ্যে স্থানে স্থানে আলোকের উন্মেষ দেখিতে

---

* পৌষমাসের সাহিত্যে লিখিত হইয়াছে :—

"সাধনা। অগ্রহায়ণ। এই সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যালের সাংখ্যদর্শন। যুক্তির মর্য্যাদা, আত্মা ও দীপশিখা এবং অদ্বৈতবাদ—লেখক সাংখ্যদর্শনপ্রস্তাবে এবার এই বিষয়ত্রয়ের অবতারণা ও বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। বক্ষ্যমান প্রবন্ধের ভাষা সহজ ও প্রাঞ্জল এবং বলিবার প্রণালী উৎকৃষ্ট। কথাপ্রসঙ্গে শুনিতে পাই বটব্যাল মহাশয়ের সাংখ্যদর্শন সাংখ্যমতের বিরুদ্ধ হইতেছে ; আমরা আশা করি তাঁহারা প্রবন্ধান্তরে স্ব স্ব মত ব্যক্ত করিবেন। যতদিন প্রতিবাদ না হয় ততদিন বটব্যাল মহাশয়ের ব্যাখ্যা অস্বীকার করিবার কারণ দেখা যায় না। দর্শনশাস্ত্রে প্রগাঢ় সংস্কার না থাকিলে এরূপ বিতর্কের মীমাংসা বা এ বিষয়ে মত প্রকাশ সম্ভবে না"।

লাগিলাম; তাহাই একণে পাঠকগণকে দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি।

মনুষ্যের রচিত কোনও শাস্ত্রই নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তিমূলক অথবা নিরবচ্ছিন্ন সত্যমূলক হইতে পারে না। কপিলের শাস্ত্রের পক্ষেও এই কথা খাটে। দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিতে গেলে গোঁড়ামী পরিত্যাগ করিতে হয়। ফলতঃ দর্শনের অনুশীলনে গোঁড়ামী অন্তর্হিত হয় বলিয়া ইহার অনুশীলন আদরণীয়।

পাঠকগণ বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে, এই প্রবন্ধমালার লেখক মহর্ষি কপিলকে একজন প্রগাঢ় ধীশক্তিসম্পন্ন সমুজ্জ্বল প্রতিভাশালী ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন; কিন্তু তা' বলিয়া তিনি কপিলকে অভ্রান্ত পুরুষ বলিয়া মানিতে প্রস্তুত নহেন। কপিলের প্রতি মনের ভাব এইরূপ থাকিলেই তাঁহার উপদেশের সারসঙ্কলন সম্ভব।

কপিলের যে সকল ভাষ্যকার কপিলকে একবারে অভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন—তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি তাহাতেই প্রকাশ। তাঁহারা কপিল যে যে স্থানে ভুলিয়াছেন তাহা বুঝিতে এবং বুঝাইতে অক্ষম। সেই মর্ম্মগ্রহণের অক্ষমতা কপিল যেখানে ভুলেন নাই সেখানেও প্রকাশিত।

একজন ভাষ্যকার কপিলসূত্রের প্রথম সূত্র ব্যাখ্যাবসরে লিখিতেছেন;—

"অথ জগদুদ্দিধীর্ষু-র্মহামুনিঃ কপিলঃ ফলসৌন্দর্য্যজ্ঞানস্য ফলেচ্ছা দ্বারা সাধনপ্রবৃত্তৌ কারণত্বং পশ্যন্ ফলসৌন্দর্য্যমাহ।

এই ভাষ্যকার কপিলকে "জগতের ত্রাণকর্ত্তা" বলিয়া বিশ্বাস করেন; এইরূপ গোঁড়া ভাষ্যকারদের ভাষ্য সতর্কতার সহিত পাঠ করিতে হয়।

ফলতঃ কপিলের শাস্ত্রকে সংসার হইতে উদ্ধারের উপায় বলিয়া অনুশীলন করিলে সেই শাস্ত্রের প্রকৃত সৌন্দর্য্য অননুভূত থাকিয়া যায়।

যাহা "কপিলসূত্র" বলিয়া এক্ষণে প্রচলিত ইহার অনেক অংশ স্পষ্টই কপিলের রচনা বলিয়া অঙ্গীকার করা যায় না।

সাংখ্যেরা যে সকল পদার্থ স্বীকার করেন "ব্যাপ্তি" তদন্তর্গত কি না ইহার বিচারে এই দুইটি সূত্র দেখা যায়;—

নিজশক্ত্যুদ্ভবমিত্যাচার্য্যাঃ। ৫—৩১
আধেয় শক্তিযোগ ইতি পঞ্চশিখঃ।—৫—৩২

এস্থলে গৌরবে বহুবচনান্ত আচার্য্যাঃ পদে আদিসাংখ্যাচার্য্য কপিলকে বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে এই সূত্র কপিলের পরবর্ত্তী শিষ্যদের বচন ইহা স্পষ্ট অনুভূত হয়। আর পঞ্চশিখাচার্য্য কপিলের বহুকাল পরে প্রাদুর্ভূত হয়েন। কপিলের বচনে পঞ্চশিখের নাম থাকা অসম্ভব। স্পষ্টই এই সূত্র কপিলের পরে রচিত।

যাঁহারা প্রণিধানের সহিত "কপিলসূত্র" পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন সূত্রের অনেকস্থলে পুনরুক্তি এবং বিসম্বাদ দেখা যায়; এই প্রবন্ধমালাতেই কোনও কোন স্থলে তাদৃশ সূত্রের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। অতএব প্রচলিত কপিলসূত্রকে ব্যক্তিবিশেষের রচনা না বলিয়া সম্প্রদায়বিশেষের রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

যদি কপিলের মূল মত কি ছিল তাহা জানিবার প্রযত্ন করা হয়—তবে সাংখ্যদর্শনের পরিভাষাতেই তাঁহার মত অন্বেষণ করিতে হইবে। আমরা যদি ইহযুগে বঙ্গভাষায় নূতন দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত করিতে বাঞ্ছা করি—তবে সাংখ্যদর্শনের পরি-

ভাষা হইতেই উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে। সেই পরিভাষার প্রকৃত অর্থ আবিষ্কারই এই প্রবন্ধমালার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য।

"দর্শন" এই কথাটিই একটি পারিভাষিক শব্দ। যাঁহারা "বেদ-" শাস্ত্র হইতে ভিন্ন "দর্শন" শাস্ত্রের মূল পত্তন করিয়াছিলেন—তাঁহারা কি বুঝিয়া নূতন শাস্ত্রকে "দর্শন" এই সমাখ্যা প্রদান করেন? —বেদশাস্ত্রে ঈশ্বর ও পরলোকের কথা; দুইটিই ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিষয়। কেহ তাহা দর্শন করে নাই—চর্ম্মচক্ষে দর্শন করিতেও পারিবে না।—মরিয়া যদি কেহ দেখিয়া থাকেন তাঁহাদের সহিত আমাদের আলাপ চলিতে পারে না। কিন্তু মনুষ্যের আত্মা দ্রষ্টব্য পদার্থ। আত্মা কি তাহা আমরা সকলেই জানি, অর্থাৎ মোটামুটি জানি। কেন না, জ্ঞানের প্রত্যেক ক্রিয়াতে আত্মার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ করা হয়। অতএব ঈশ্বর ও পরলোক বিজ্ঞান—"অদৃষ্ট" বিষয়ক; আর আত্মবিজ্ঞান "দৃষ্ট"-বিষয়ক। অতএব যে বিজ্ঞানে আত্মার তত্ত্ব অধীত ও আলোচিত ও উপদিষ্ট হয়, তাহাকে বেদ হইতে পৃথক বিবেচনা করিয়া "দর্শন" বলিয়া তাহার নূতন নামকরণ হইল। বাহ্যজগতের তত্ত্ব দর্শনযোগ্য বলিয়া এই বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত।

যাঁহারা "দর্শন" এই পরিভাষার সৃষ্টিকর্তা তাঁহারা যে, দর্শন ও বেদের মধ্যে প্রমাণপ্রমেয়গত ভেদ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই—ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।

আমি বলিয়াছি দর্শনশাস্ত্রে শ্রুতি প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। এই কথা হয় ত অনেকের সাংখ্যমতের বিপরীত ও বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। কেন না, কপিলসূত্রের কোনও কোনও স্থানে শ্রুতিকেও প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা হই-

য়াছে। আমি বিবেচনা করি কপিল "শ্রুতিকে" প্রমাণ অঙ্গীকার করিলেও তাহাকে দার্শনিক প্রমাণ বলিয়া অঙ্গীকার করেন নাই। ঈশ্বর ও পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে শ্রুতি প্রমাণ হইতে পারে; কিন্তু "দর্শন"শাস্ত্রে শ্রুতি প্রমাণ নহে। প্রত্যক্ষ ও অনুমানকেই কপিল স্বীয় বিজ্ঞানের একমাত্র ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং শ্রুতিকে কেবল ব্রহ্মবিজ্ঞানেরই ভিত্তি বলিয়া মানিতেন।

যাঁহারা মনে করেন যে, কপিল ঈশ্বর মানিতেন না—আমি বিবেচনা করি তাঁহারা ভ্রান্ত। তবে কপিল স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন যে, দর্শনশাস্ত্রসঙ্গত প্রমাণে ঈশ্বর প্রমাণিত হন না।—তিনি বলিয়া গিয়াছেন—

প্রমাণাভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ॥ ৫—১০
সংবন্ধাভাবাৎ নানুমানম্॥ ৫—১১

ভাষ্যকার লেখেন—

"তৎসিদ্ধিঃ—নিত্যেশ্বরসিদ্ধিঃ। ঈশ্বরে তাবৎ প্রত্যক্ষং নাস্তি। অনুমান শাব্দাবেব প্রমাণে প্রমাণে বক্তব্যে। তে চ ন সংভবত ইত্যর্থঃ।—

এইটি অপব্যাখ্যার একটি নিদর্শনস্থল—আচার্য্যের প্রকৃত মত ভাষ্যকারগণ কি প্রণালীতে অপলাপ করিয়াছেন, শ্বেতকে কিরূপে তাঁহারা কৃষ্ণ করিয়াছেন ইহা তাহার একটি দৃষ্টান্তস্থল। মূলে "শাব্দ" বা শ্রুতিপ্রমাণের কথামাত্র নাই। কিন্তু ভাষ্যকার গোঁজামিশাল দিয়াছেন।

কপিল বলিতে চাহেন যে, তিনি স্বীয় বিজ্ঞানে যাহা প্রমাণ বলিয়া অঙ্গীকার করেন তাদৃশ প্রমাণে ঈশ্বর আছেন, এ কথা প্রমাণ হয় না। প্রত্যক্ষের দ্বারা ঈশ্বরকে প্রমাণ হয়

না; এবং প্রত্যক্ষের সহিত কোনও সম্বন্ধ না থাকায় অনুমানের দ্বারাও প্রমাণ হয় না।

ভাষ্যকার বা পরকালবর্ত্তী কপিলশিষ্যেরা যে, "শ্রুতির প্রমাণেও ঈশ্বর অসিদ্ধ" এই এক নূতন কথা যোগ করিয়া দিয়াছেন ইহা নিতান্ত অসত্য। শ্রুতিকে প্রমাণ বলিয়া ধরিলে তদ্দ্বারা ঈশ্বর আছেন একথা প্রতিপন্ন হয় না যিনি বলিবেন তিনি নিতান্ত বাতুল। শ্রুতিকে প্রমাণ বলিয়া ধরিলে—

"প্রমাণাভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ।" ৫-১০

—এ কথা কপিলের মুখ হইতে বাহির হওয়া অসম্ভব। ঈশ্বর আছেন—ঈশ্বর আছেন—এ কথা শ্রুতির আদি—শ্রুতির মধ্য—শ্রুতির অন্ত।

কপিল যখন বলিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর আছেন, ও কথায় প্রমাণ নাই—তখন তিনি প্রমাণ অর্থে কেবল প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটিকেই প্রমাণ বলিয়া ধরিয়াছিলেন। তজ্জন্য আমার বিশ্বাস যে, মূল কপিলবিজ্ঞানে "শ্রুতি" প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় নাই। নতুবা "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ"—"প্রমাণাভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ" ইত্যাদি সূত্র কপিলের দ্বারা উপদিষ্ট হইত না। সাংখ্যদর্শনের সময়ে শ্রুতি যে, কোনও কোনও স্থানে প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হইয়াছে—ইহা অর্ব্বাচীন কপিলশিষ্যদের ভ্রমমাত্র। আমার বিবেচনায় যে যে সূত্রে শ্রুতিকে প্রমাণ বলিয়া সাংখ্যমতের পোষকতার চেষ্টা করা হইয়াছে—সে সমুদায় কপিল হইতে অর্ব্বাচীন।

যাঁহারা এই প্রবন্ধমালা পাঠ করিবেন, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি যে, যাহা কপিলসূত্র বলিয়া পরিগণিত তাহা ব্যক্তিবিশেষের রচনা নহে—সম্প্রদায়বিশেষের রচনাভাণ্ডার—এই

কথাটি স্মরণ রাখিবেন। তাঁহারা যেন ভাষ্যকারদের ব্যাখ্যা সাবধানতার সহিত গ্রহণ করেন। এবং তাঁহারা অসারের মধ্যে যেন সারান্বেষণের চেষ্টা করেন।

কপিলসূত্রভাণ্ডারেই এ সম্বন্ধে কতকগুলি রত্নস্বরূপ উপদেশ দেখা যায়। যথা—

"বহুশাস্ত্র গুরূপাসনেঽপি সারাদানং ষট্‌পদবৎ ॥৪—১৩

ভাষ্য। শাস্ত্রেভ্যো গুরুভ্যশ্চ সারএব গ্রাহ্যঃ। অন্যথা অভ্যুপগমবাদাদিভিঃ উক্তে অসারভাগে অন্যোহন্যবিরোধেন অর্থবাহুল্যেন চ একাগ্রতায়া অসংভবাৎ।"

—অর্থাৎ শাস্ত্রসমূহে যাহা পাঠ করা যায় এবং গুরুগণ হইতে যাহা উপদেশ পাওয়া যায়—তাহার এক অংশ সার—অপর অংশ অসার। সারাংশই গ্রাহ্য। অনেক স্থলে "অভ্যুপগম"* ও "বাদ" আদি দ্বারা অসার কথা আসিয়া পড়ে। অনেক স্থলে বিরুদ্ধ কথা দেখা যায়; অনেক স্থলে নানা অর্থে ব্যবহার্য্য শব্দের প্রয়োগ থাকে। যে পাঠক এইসকল কথা স্মরণ না রাখিয়া সারভাগ ও অসার ভাগ তুল্যরূপে গ্রহণ করেন তাঁহার মূল বিষয়ে একাগ্রতা পৌঁছে না।

আর এক সূত্র এই—

"ন উপদেশশ্রবণেঽপি কৃতকৃত্যতা; পরামর্শাদৃতে বিরোচনবৎ।" ৪—১৭

ভাষ্য। পরামর্শো গুরুবাক্যতাৎপর্য্যনির্ণায়কো বিচারঃ। তং বিনা উপদেশবাক্যশ্রবণেঽপি তত্ত্বজ্ঞাননিয়মো নাস্তি। প্রজাপতেরুপদেশশ্রবণেঽপি ইন্দ্রবিরোচনয়োর্মধ্যে বিরোচনস্য পরামর্শাভাবেন বিবেকাভাবশ্রুতেরিত্যর্থঃ।

---

* অভ্যুপগম implication অর্থাৎ আভাস। যাহা স্পষ্টাক্ষরে উপদিষ্ট না হইয়াও উপদেষ্টা কর্তৃক অঙ্গীকৃত বলিয়া বোধ হয়। বাদ=তর্ক। বিপক্ষকে পরাজয়করণার্থ যেমন-তেমন তর্ককে বাদ বলা যায়।

—অর্থাৎ গুরুমুখে যাহা শুনিবে স্বাধীন চিন্তাদ্বারা তাহার তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে যত্ন না করিলে উপদেশ শ্রবণ ব্যর্থ হয়।

সর্ব্বাপেক্ষা মধুর আর একটি সূত্র এই :—

"ন মলিনচেতসি উপদেশবীজপ্ররোহঃ, অজবৎ।" ৫—২৯

ভাষ্য। উপদেশরূপং যৎ জ্ঞানবৃক্ষস্য বীজং তস্য অঙ্কুরোঽপি রাগাদিমলিন চিত্তে নোপপদ্যতে। অজবৎ। যথা অজনাম্নি নৃপে ভার্য্যাশোকমলিনচিত্তে বসিষ্ঠেন উপ্তস্যাপি উপদেশবীজস্য ন অঙ্কুর উৎপন্ন ইত্যর্থঃ।

—অর্থাৎ চিত্ত যদি রাগদ্বেষাদি দ্বারা মলিন থাকে তথায় উপদেশের বীজ অঙ্কুরিত হয় না। শাস্ত্রার্থের অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইলে পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন চিন্তার আশ্রয় লইতে হইবে ; এবং শাস্ত্রের মধ্যে কোন্ কথা সার, কোন্ কথা অসার তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

দর্শনশাস্ত্রে শ্রুতির বচন প্রমাণ বলিয়া অঙ্গীকৃত হইতে পারে না—আমার বিবেচনায় সাংখ্যবিজ্ঞানের এইটি একটি অতীব সারগর্ভ উপদেশ। কিন্তু অনেক শিষ্য আচার্য্যের এই উপদেশ বিস্মৃত হইয়াছেন।

---

# মাটির উৎপত্তি ও প্রকৃতি।

আদিম কালের তরল পৃথিবী শীতল হইয়া প্রথমে কঠিনাকার ধারণ করিল ; তাহার পর সেই কঠিন আবরণ গুঁড়া হইয়া কেমন করিয়া মাটি হইল তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

সূর্য্যের তাপে সমুদ্রাদি জলাশয়ের উপরিস্থ জল বাষ্পরাশিতে

পরিণত হইয়া উপরে উঠে, আবার বৃষ্টি-আকারে সবেগে নীচে পড়িয়া ভূপৃষ্ঠকে আঘাত করিতে থাকে। সেই আঘাতবেগে পাথর ক্ষয় হইয়া তাহার বিচ্ছিন্ন কণাগুলি বালুকারাশিতে পরিণত হইতে থাকে।

এই ক্ষয়প্রাপ্ত প্রস্তরে সর্ব্বপ্রথমে "লিচেন" প্রভৃতি শেওলা জন্মিতে থাকে। ইহাদের তেমন পৃথক্ শিকড় নাই, কিন্তু ইহারা ভূমির সহিত এমন দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া যায় যে, পৃথিবী হইতে কতক পরিমাণে খনিজ পদার্থ টানিয়া লইতে পারে। এ উদ্ভিদ্‌-গুলি জল ব্যতীত বৎসরের অধিকাংশ কাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে। তবে বায়ু আর্দ্র থাকিলে এবং ভূমি হইতে প্রচুর পরিমাণে জল পাইলে তাহারা সতেজ হইয়া উঠে। কিছু কাল পরে এগুলি মরিয়া যায়, কিন্তু তাহাদের ধ্বংসাবশেষ হইতে যে কার্ব্বনিক অ্যাসিড্ উৎপন্ন হয়, তাহাতে ক্ষয়কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করে। বিশুদ্ধ বৃষ্টির জলের সহিত কার্ব্বনিক অ্যাসিড্ মিশিলে তাহার মার্ব্বল্ ক্ষয় করিবার শক্তি পঞ্চাশগুণ বাড়িয়া উঠে। এখন বুঝা গেল তরুলতা জন্মাইবার পর মৃত্তিকানির্ম্মাণ কার্য্য সহজ হইয়া আইসে। জলের ধ্বংস করিবার শক্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং সেই পরিমাণে প্রস্তরমালা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া মৃত্তিকা উৎপন্ন হয়।

"লিচেন"গুলি একবার বসিয়া গেলে মাটিনির্ম্মাণকার্য্য দ্রুত চলিতে থাকে। চঞ্চল বালুকারেণুগুলি আশ্রয় পাইয়া তাহাদিগের সহিত এরূপ জড়িত হইয়া যায় যে, আর বৃষ্টির জলে ধুইয়া যায় না। মৃত্তিকারাশি দিন দিন গুরু হইয়া উঠিতে থাকে, অল্পকাল মধ্যে ভূমি মূলবিশিষ্ট উচ্চশ্রেণীর তরুলতাদির বাসোপযোগী হইয়া উঠে। জল পাইলে এগুলি শীঘ্র বাড়িয়া

উঠে, তদভাবে মরিয়া যায়। কিন্তু তাহাদের ধ্বংসে যে কার্ব্বনিক অ্যাসিড্ উৎপন্ন হয় তাহাতে মৃত্তিকারাশির পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এইরূপ একশত বর্ষের মধ্যে ভূপৃষ্ঠের এতদূর রূপান্তর হয় যে, শৈবালাদির ত কথা নাই, উচ্চশ্রেণীর তরুলতাদিরও আবির্ভাব হইয়া মাটির গভীরতা উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে।

পাঠকের যদি এই পৃথিবীপেষণ ব্যাপারটী সবিস্তারে বুঝিতে কৌতূহল হইয়া থাকে, তাহা হইলে পার্ব্বতীয় প্রদেশের ঊর্দ্ধভাগে প্রতিনিয়ত যে রূপান্তর হইতেছে, তাহা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করি। তিনি দেখিতে পাইবেন যে, শৈলখণ্ডসমূহ ক্ষয় করিবার নিমিত্ত কতকগুলি শক্তি কার্য্য করিতেছে। আমরা পূর্ব্বেই বৃষ্টির জলের বিষয় বলিয়াছি। দুই এক পস্‌লা জলের কার্য্য সামান্য হইতে পারে, কিন্তু বহুকাল ধরিয়া যখন ইহা বিদ্যমান থাকিয়া ক্ষয়কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে, তখন ইহাকে আর তুচ্ছ বলা যায় না। বারিবর্ষণ কালে যে বিদ্যুৎ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাও সামান্য শক্তি নহে, তাহা পর্ব্বতশৃঙ্গে আহত হইয়া শৈলমালাকে ভাঙ্গিয়া ফেলে। ইহা ছাড়া আর একটী শক্তি আছে, তাহা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ। ইহার বলে প্রস্তরখণ্ডসমূহ নিম্নে চালিত হয় ও পরস্পরের আঘাতপ্রতিঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। ইহার উপর আবার বরফের কার্য্য। আস্ত পাথরের মধ্যে স্থানে স্থানে অতি সূক্ষ্ম ফাটল বা বিভাগ-রেখা আছে। তাহাকে সন্ধিস্থল কহে। এ রেখাগুলি প্রথমে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু কৈশিকার্ষণ প্রভাবে তাহাদিগের মধ্যে জল প্রবেশ করে, ও বিভাগরেখার ভিতরে ব্যাপ্ত হইয়া প্রস্তরখণ্ডগুলিকে

কিয়ৎ পরিমাণে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। আবার শীতের সময় যখন সেই গ্রন্থিপ্রবিষ্ট জল বরফ হইয়া আয়তনে বাড়িয়া যায় তখন পাথরটাকে একেবারে সবেগে বিদীর্ণ করিয়া ফেলে।

গাছের শিকড়ের দ্বারা এই ক্ষয়কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হয়। শিকড়গুলি পাথরের ছিদ্রের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া চাড়া লাগাইতে থাকে। আবার প্রবল ঝড়ে কিম্বা অন্য কারণে বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হইলে, শিকড়গুলির টানে পাথর ভাঙ্গিয়া নিম্নে ঝরিয়া পড়ে। অনেক উচ্চ পর্ব্বতের উপর বরফের স্রোত জাঁতার কাজ করিয়া থাকে। বরফের উপর বরফ জমিয়া গুরুভার হইয়া চাপ বাঁধিয়া যতই নিম্নে ধাবমান হয়, ইহার গতি ও শক্তি ততই বাড়িতে থাকে। ইহা ভীষণবেগে চলিবার সময় পথবর্ত্তী পাথরগুলিকে ঘর্ষণ পেষণ ও স্থানভ্রষ্ট করিয়া পরিশেষে নিকটবর্ত্তী নদীতে গিয়া পড়ে।

নদীগর্ভে শিলাখণ্ডসমূহ চূর্ণীকৃত হইয়া বালুকা ও কর্দ্দম-রাশিতে পরিণত হয়, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই মৃত্তিকা-রাশির কিয়দংশ নদীগর্ভে ব্যাপ্ত হইয়া তাহাকে উন্নত করে, কিয়দংশ নদীর স্রোতে বাহিত হইয়া সমুদ্রে গিয়া পড়ে। কিন্তু ইহার অধিকাংশ নদীর উপকূলস্থ ভূভাগ বৃদ্ধি করে। ইহা দ্বারা ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হয়। এইজন্য নদী-পার্শ্বস্থ প্রদেশ প্রায়ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উর্ব্বরা হইতে দেখা যায়। চূর্ণীকৃত এই মৃত্তিকারাশি দ্বারা আমাদের কৃষিকার্য্যের যে বিশেষ সুবিধা হয়, ইহা বলা বাহুল্যমাত্র।

নদীর মোহানার নিকট স্রোতের বেগ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসে। সমুদ্রের স্রোতে ইহার গতিরোধ হয়, এবং লবণাক্ত জলে বালুকা ও মৃত্তিকারাশি থিতাইয়া উভয়পার্শ্বে নূতন

ভূভাগের সৃষ্টি করে। প্রথমে এগুলি জলে ডুবিয়া থাকে, কিন্তু উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে মৃত্তিকা সঞ্চিত হওয়ায় ইহারা ক্রমশঃ উন্নত হইয়া উঠে। যখন এতদূর উন্নত হয় যে, চাষের সময় আর জলে ডুবিয়া যায় না, তখন এই ভূমি প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদন করে। সুন্দরবনের অনেকাংশ সম্প্রতি বাসোপযোগী হইয়াছে। এক সময়ে ইহা সাগরগর্ভে নিহিত ছিল, কিন্তু কালসহকারে ইহার কিরূপ আশ্চর্য্যজনক পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও হইতেছে, ইহা সকলেই অবগত আছেন।

নদীতট হইতে বহুদূরে উপত্যকাপ্রদেশে আর একপ্রকার মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। পলিমৃত্তিকাময় বন্যার জল ততদূর পৌঁছাইতে পারে না। এ স্থানের ঢালুতা এত অল্প যে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তিদ্বারা মৃত্তিকারাশি নিকটবর্ত্তী নদীতে চালিত হইতে পারে না। এ মৃত্তিকা নিম্নস্থ প্রস্তরখণ্ড হইতে উৎপন্ন।

বৃক্ষাদি উৎপাটিত হইলে মৃত্তিকা-গঠনের বিশেষ সুবিধা হয়, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মহাত্মা ডারুয়িন্ কহেন, কেঁচুয়া প্রভৃতি কীটেরা গভীরস্থান হইতে মৃত্তিকা ভূপৃষ্ঠে আনয়ন করে। পণ্ডিতবর শেলরের মতে পিপীলিকার কার্য্যও ঠিক এইরূপ। এ ক্ষুদ্র কীটসমূহও এই মহৎ কার্য্যে নিযুক্ত।

উপরিস্থ মৃত্তিকাস্তরের ঠিক্ নিম্নে যে স্তর, তাহাকে সাব্‌সয়েল্ অর্থাৎ নিম্নমৃত্তিকা-স্তর কহে। উভয় স্তরের মধ্যে প্রভেদ এই, নিম্ন-স্তরটী অধিক কঠিন ও নিরেট। এই নিম্ন-স্তর কালসহকারে জমিতে পরিণত হয়। ইহার নির্ম্মাণকার্য্য সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা অনাবশ্যকীয় নহে। বৃষ্টির জলের কিয়দংশ ভূমির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। গমন করিবার সময় বৃক্ষাদির ধ্বংসাবশেষ ইহার পথে পতিত হয়। তখন বিশুদ্ধ জলে যে

অক্সিজেন্ আছে তাহা কিয়ৎপরিমাণে বিমুক্ত হইয়া উদ্ভিদের কার্ব্বনের সহিত রাসায়নিক সংযোগে কার্ব্বনিক-অ্যাসিড্ গ্যাস্ উৎপাদন করে। জলের অপরাংশ এই কার্ব্বনিক্ অ্যাসিড্ গ্যাসের সহিত মিলিত হয় এবং নিম্নে গমন করিয়া প্রস্তরখণ্ড ক্ষয় করিতে থাকে। লবণ কিম্বা শর্করা যেরূপ জলে ফেলিলে মিলাইয়া যায়, এই কার্ব্বনিক্ অ্যাসিড্ মিশ্রিত বৃষ্টির জলে প্রস্তরখণ্ডও ঠিক্ সেই দশা প্রাপ্ত হয়। প্রস্তরমালা ক্ষয় করিতে করিতে ইহা বহুনিম্নে গিয়া পৌঁছে। লাইম্-ষ্টোন্ (চূণেপাথর) ইহার কবলে পতিত হইলে একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং বৃহৎ বৃহৎ গহ্বর উৎপন্ন হয়। কখন কখন নিম্নস্থ শৈলখণ্ড একেবারে মৃত্তিকায় পরিণত হয়।

যে প্রস্তর চূর্ণীকৃত হইয়া মৃত্তিকা উৎপন্ন হয়, তাহার রাসায়নিক প্রকৃতির উপর জমির উর্ব্বরতা নির্ভর করে। যদ্যপি জমি প্রস্তর হইতে প্রচুর পরিমাণে মৃত্তিকা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ইহা নিশ্চয়ই উর্ব্বরা হইবে। তবে কোন কারণবশতঃ মাটি অতিশয় গুঁড়া হইয়া সূক্ষ্মরেণুবিশিষ্ট হইলে তাহাতে জল থাকিতে পারে না, তাহার ভিতর বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না, এবং তরুলতাদির জন্মিবার পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত হয়।

আর এক কথা। অতি পুরাকালে যে সকল জীব পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহাদের দেহাবশেষ অনেক পুরাতন প্রস্তরের মধ্যে প্রোথিত আছে দেখা যায়। এখন এই দেহাবশেষের কার্য্যদ্বারা যে পদার্থ উৎপন্ন হইয়া প্রস্তরে নিহিত থাকে প্রধানতঃ তাহার উপর জমির উর্ব্বরতা নির্ভর করে। শম্বুক প্রভৃতি সামুদ্রিক জন্তুর কঙ্কাল limey phosphate চূণে-পাথরে গঠিত। তাহারা খাদ্য হইতে এই পদার্থ গ্রহণ করিতে পারে। তাহারা

মরিয়া গেলে এই পদার্থ স্তরে রক্ষিত হয়। এই ফস্ফ্যাটিক্ পদার্থ দ্বারা জমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হয়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং জীবের দেহাবশেষ হইতে যে পদার্থ প্রস্তরাভ্যন্তরে নিহিত থাকে, তাহার সহিত জমীর প্রকৃতির বিশেষ সম্বন্ধ। এইরূপে ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, একযুগের প্রাণী পরবর্ত্তী যুগের প্রাণীর সহায়তা করে।

এখন দেখা গেল যে, যে পদার্থে অধিক পরিমাণে ফস্ফরস্ আছে, জমির উর্ব্বরতার জন্য তাহাই একান্ত প্রয়োজন। কোন কোন স্থানে নিম্নস্তর অতি শীঘ্র চূর্ণীকৃত হইয়া মৃত্তিকাতে পরিণত হয়। সে সকল স্থানের উর্ব্বরতা রক্ষার জন্য সারের দরকার নাই।

আমাদের আর একটি কথা বলিবার আছে। মাটিতে এমন একটি পদার্থ আছে যাহা বৃক্ষাদি মূল দ্বারা গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হয়। তাহার পরিমাণ অতি অল্প। স্বভাবতঃ মাটি যতই উর্ব্বরা হউক্ না কেন, মনুষ্যের যত্নে ও পরিশ্রমে মাটী যতই উৎকর্ষ লাভ করুক্ না কেন, এ পদার্থ না থাকিলে সমস্তই বৃথা। ইহার একটী বিশেষ গুণ এই যে, তরুলতাদির কার্য্যদ্বারা ইহা স্বতই তরলতা প্রাপ্ত হইয়া মূলদ্বারা গৃহীত হয়। নচেৎ মৃত্তিকা সহিত মিশাইয়া জলে ধৌত হইয়া প্রথমে নদী ও পরিশেষে সমুদ্রে গিয়া পড়ে। অতএব যাহাতে এরূপ আত্যাবশ্যকীয় পদার্থ জমি হইতে দূরীভূত না হয়, এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

চাষের দ্বারা যে জমির গভীরতার দিন দিন হ্রাস হয়, তাহার আর সন্দেহ নাই। চাষের পূর্ব্বেই ভূপৃষ্ঠস্থ তৃণাচ্ছাদন দূরীভূত

হয়, জমি বারিবর্ষণে ধুইয়া যায়, সুতরাং মৃত্তিকার পরিমাণও কমিয়া যায়। আবার মৃত্তিকার উপরিভাগ যে পরিমাণে বসিয়া যায়, নিম্নভাগ সে পরিমাণে বসিয়া যায় না। ইহার কারণ দ্বিবিধ—প্রথম, তৃণাচ্ছাদিত থাকিলে মৃত্তিকার উপরিভাগের যে পরিমাণ ক্ষয় হয়, তাহা অনাবৃত থাকিলে তদপেক্ষা ক্ষয় অধিক হইয়া থাকে; দ্বিতীয়, তৃণাদি উপড়াইয়া ফেলিলে শিকড় কর্ত্তৃক নিম্নস্থ স্তরে যে ধ্বংস-কার্য্য হয়, তাহা বন্ধ হইয়া যায়, এবং জল উদ্ভিদ্ হইতে যে পরিমাণে গ্যাস্ প্রাপ্ত হয়, তাহাও কমিয়া যাওয়ায় প্রস্তর-খনন কার্য্যের বিশেষ প্রতিবন্ধক জন্মে। কিন্তু নদীর উভয়পার্শ্বে ও সমুদ্রের মোহানার নিকট যে জমি অবস্থিত তাহাদের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। কারণ, যেমন একদিকে তাহাদের মৃত্তিকা বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া যায়, তেমন আবার বাৎসরিক বন্যার সময় প্রচুর পরিমাণে নূতন মৃত্তিকা সঞ্চিত হইয়া সে ক্ষতিপূরণ হয়।

---

## বিদায়-অভিশাপ।

দেবগণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বৃহস্পতিপুত্র কচ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের নিকট হইতে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিবার নিমিত্ত তৎসমীপে গমন করেন। সেখানে সহস্র বৎসর অতিবাহন করিয়া এবং নৃত্যগীতবাদ্য দ্বারা শুক্রদুহিতা দেবযানীর মনোরঞ্জনপূর্ব্বক সিদ্ধকাম হইয়া কচ দেবলোকে প্রত্যাগমন করেন। দেবযানীর নিকট হইতে বিদায়কালীন ব্যাপার নিম্নে বিবৃত হইল।

কচ। দেহ আজ্ঞা, দেবযানী, দেবলোকে দাস
করিবে প্রয়াণ। আজি গুরুগৃহবাস

সমাপ্ত আমার। আশীর্ব্বাদ কর মোরে
যে বিদ্যা শিখিনু তাহা চিরদিন ধরে'
অন্তরে জাজ্বল্য থাকে উজ্জ্বল রতন,
সুমেরুশিখরশিরে সূর্য্যের মতন,
অক্ষয় কিরণে।

দেবযানী। মনোরথ পূরিয়াছে,
পেয়েছ দুর্লভ বিদ্যা আচার্য্যের কাছে,
সহস্রবর্ষের তব দুঃসাধ্য সাধনা
সিদ্ধ আজি; আর কিছু নাহি কি কামনা
ভেবে দেখ মনে মনে!

কচ। আর কিছু নাহি।

দেবযানী। কিছু নাই? তবু আরবার দেখ চাহি
অবগাহি হৃদয়ের সীমান্ত অবধি
করহ সন্ধান; অন্তরের প্রান্তে যদি
কোন বাঞ্ছা থাকে, কুশের অঙ্কুরসম
ক্ষুদ্র, দৃষ্টি-অগোচর, তবু তীক্ষ্ণতম!

কচ। আজি পূর্ণ কৃতার্থ জীবন। কোন ঠাঁই
মোর মাঝে কোন দৈন্য কোন শূন্য নাই
সুলক্ষণে!

দেবযানী। তুমি সুখী ত্রিজগৎ মাঝে!
যাও তবে ইন্দ্রলোকে আপনার কাজে
উচ্চশিরে গৌরব বহিয়া! স্বর্গপুরে
উঠিবে আনন্দধ্বনি, মনোহর সুরে
বাজিবে মঙ্গল-শঙ্খ, সুরাঙ্গনাগণ
করিবে তোমার শিরে পুষ্প বরিষণ

করিবে তোমার শিরে পুষ্প বরিষণ
সদ্যছিন্ন নন্দনের মন্দার-মঞ্জরী।
স্বর্গপথে কলকণ্ঠে অপ্সরী কিন্নরী
দিবে হুলুধ্বনি। আহা, বিপ্র, বহুক্লেশে
কেটেছে তোমার দিন বিজনে বিদেশে
সুকঠোর অধ্যয়নে! নাহি ছিল কেহ
স্মরণ করায়ে দিতে সুখময় গেহ,
নিবারিতে প্রবাস-বেদনা! অতিথিরে
যথাসাধ্য পূজিয়াছি দরিদ্রকুটীরে
যাহা ছিল দিয়ে। তাই বলে' স্বর্গসুখ
কোথা পাব, কোথা হেথা অনিন্দিত মুখ
সুরললনার! বড় আশা করি মনে
আতিথ্যের অপরাধ রবে না স্মরণে
ফিরে গিয়ে সুখলোকে!

কচ। সুকল্যাণ হাসে
প্রসন্ন বিদায় আজি দিতে হবে দাসে!

দেবযানী। হাসি? হায় সখা, এ ত স্বর্গপুরী নয়!
পুষ্পে কীটসম হেথা তৃষ্ণা জেগে রয়
মর্ম্মমাঝে, বাঞ্ছা ঘুরে বাঞ্ছিতেরে ঘিরে,
লাঞ্ছিত ভ্রমর যথা বারম্বার ফিরে
মুদ্রিত পদ্মের কাছে। হেথা সুখ গেলে'
স্মৃতি একাকিনী বসি দীর্ঘশ্বাস ফেলে
শূন্যগৃহে; হেথায় সুলভ নহে হাসি।
যাও বন্ধু, কি হইবে মিথ্যা কাল নাশি,
উৎকণ্ঠিত দেবগণ।—

যেতেছ চলিয়া?
সকলি সমাপ্ত হল দু'কথা বলিয়া!
দশশত বর্ষ পরে এই কি বিদায়?

কচ। দেবযানী, কি আমার অপরাধ!

দেবযানী হায়!
সুন্দরী অরণ্যভূমি সহস্র বৎসর
দিয়েছে বল্লভ ছায়া, পল্লবমর্ম্মর,
শুনায়েছে বিহঙ্গকূজন,—তারে আজি
এতই সহজে ছেড়ে যাবে? তরুরাজি
ম্লান হয়ে আছে যেন, হের আজিকার
বনচ্ছায়া গাঢ়তর শোকে অন্ধকার,
কেঁদে ওঠে বায়ু, শুষ্ক পত্র ঝরে' পড়ে,
তুমি শুধু চলে' যাবে সহাস্য অধরে
নিশান্তের সুখস্বপ্নসম?

কচ। দেবযানী,
এ বনভূমিরে আমি মাতৃভূমি মানি,
হেথা মোর নবজন্মলাভ। এর পরে
নাহি মোর অনাদর,—চিরপ্রীতিভরে
চিরদিন করিব স্মরণ।

দেবযানী। এই সেই
বটতল, যেথা তুমি প্রতি দিবসেই
গোধন চরাতে এসে পড়িতে ঘুমায়ে
মধ্যাহ্নের খরতাপে; ক্লান্ত তব কায়ে
অতিথিবৎসল তরু দীর্ঘ ছায়াখানি
দিত বিছাইয়া, সুখসুপ্তি দিত আনি

ঝর্ঝর পল্লবদলে করিয়া বীজন
মৃদুস্বরে ;—যেয়ো সখা, তবু কিছুক্ষণ
পরিচিত তরুতলে বস, শেষবার
নিয়ে যাও সম্ভাষণ এ স্নেহছায়ার ;—
দুই দণ্ড থেকে যাও, সে বিলম্বে তব
স্বর্গের হবে না কোন ক্ষতি !

কচ। অভিনব
বলে' যেন মনে হয় বিদায়ের ক্ষণে
এই সব চিরপরিচিত বন্ধুগণে ;
পলাতক প্রিয়জনে বাঁধিবার তরে
করিছে বিস্তার সবে ব্যগ্র স্নেহভরে
নূতন বন্ধনজাল, অন্তিম মিনতি,
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশি। ওগো বনস্পতি,
আশ্রিতজনের বন্ধু, করি নমস্কার !
কত পান্থ বসিবেক ছায়ায় তোমার,
কত ছাত্র কতদিন আমার মতন
প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছায়তলে নীরব নির্জ্জন
তৃণাসনে, পতঙ্গের মৃদুগুঞ্জস্বরে,
করিবেক অধ্যয়ন ; প্রাতঃস্নান পরে
ঋষিবালকেরা আসি সজল বল্কল
শুকাবে তোমার শাখে ; রাখালের দল
মধ্যাহ্নে করিবে খেলা, ওগো তারি মাঝে
এ পুরাণো বন্ধু যেন স্মরণে বিরাজে !

দেবযানী। মনে রেখো আমাদের হোমধেনুটিরে ;
স্বর্গসুধা পান করে' সে পুণ্য গাভীরে

ভুলো না গরবে!

কচ। স্নধা হতে স্নধাময়
দুগ্ধ তার; দেখে' তারে পাপক্ষয় হয়,
মাতৃরূপা, শান্তিস্বরূপিনী, শুভ্রকান্তি
পয়স্বিনী। না মানিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা শ্রান্তি
তারে করিয়াছি সেবা; গহন কাননে
শ্যামশষ্প স্রোতস্বিনী তীরে, তারি সনে
ফিরিয়াছি দীর্ঘ দিন; পরিতৃপ্তিভরে
স্বেচ্ছামতে ভোগ করি' নিম্নতট পরে
অপর্য্যাপ্ত তৃণরাশি স্নস্নিগ্ধ কোমল—
আলস্য-মন্থর তনু লভি' তরুতল
রোমন্থ করেছে ধীরে শুয়ে তৃণাসনে
সারা বেলা; মাঝে মাঝে বিশাল নয়নে
সকৃতজ্ঞ শান্ত দৃষ্টি মেলি,' গাঢ়স্নেহ
চক্ষু দিয়া লেহন করেছে মোর দেহ।
মনে রবে সেই দৃষ্টি স্নিগ্ধ অচঞ্চল,
পরিপুষ্ট শুভ্র তনু চিক্কণ পিচ্ছল।

দেবযানী। আর মনে রেখো, আমাদের কলস্বনা
স্রোতস্বিনী বেণুমতী।

কচ। তারে ভুলিব না।
বেণুমতী, কত কুস্নমিত কুঞ্জ দিয়ে
মধুকণ্ঠে আনন্দিত কলগান নিয়ে
আসিছে শুশ্রূষা বহি গ্রাম্যবধূসম
সদা ক্ষিপ্রগতি, প্রবাসসঙ্গিনী মম
নিত্য শুভব্রতা।

দেবযানী। হায় বন্ধু, এ প্রবাসে
আরো কোন সহচরী ছিল তব পাশে,
পরগৃহবাসদুঃখ ভুলাবার তরে
যত্ন তার ছিল মনে রাত্রি দিন ধরে' ;—
হায় রে দুরাশা!
কচ। চিরজীবনের সনে
তার নাম গাঁথা হয়ে গেছে।
দেবযানী। আছে মনে
যেদিন প্রথম তুমি আসিলে হেথায়
কিশোর ব্রাহ্মণ, তরুণ অরুণপ্রায়
গৌরবর্ণ তনুখানি স্নিগ্ধ দীপ্তিঢালা,
চন্দনে চর্চ্চিত ভাল, কণ্ঠে পুষ্পমালা,
পরিহিত পট্টবাস, অধরে নয়নে
প্রসন্ন সরল হাসি, হোথা পুষ্পবনে
দাঁড়ালে আসিয়া—
কচ। তুমি সদ্য স্নান করি
দীর্ঘ আর্দ্র কেশজালে, নব শুক্লাম্বরী
জ্যোতিস্নাত মূর্ত্তিমতী উষা, হাতে সাজী
একাকী তুলিতেছিলে নব পুষ্পরাজি
পূজার লাগিয়া। কহিনু করি বিনতি
"তোমারে সাজে না শ্রম, দেহ অনুমতি
ফুল তুলে দিব দেবী"!
দেবযানী। আমি সবিস্ময়
সেই ক্ষণে শুধানু তোমার পরিচয়।
বিনয়ে কহিলে,—আসিয়াছি তব দ্বারে

তোমার পিতার কাছে শিষ্য হইবারে
আমি বৃহস্পতিসুত।

কচ। শঙ্কা ছিল মনে
পাছে দানবের গুরু স্বর্গের ব্রাহ্মণে
দেন ফিরাইয়া।

দেবযানী। আমি গেনু তাঁর কাছে।
হাসিয়া কহিনু—পিতা, ভিক্ষা এক আছে
চরণে তোমার।—স্নেহে বসাইয়া পাশে
শিরে মোর দিয়ে হাত শান্ত মৃদু ভাষে
কহিলেন—কিছু নাহি অদেয় তোমারে।
কহিলাম—বৃহস্পতিপুত্র তব দ্বারে
এসেছেন, শিষ্য করি লহ তুমি তাঁরে
এ মিনতি।—সে আজিকে হল কত কাল
তবু মনে হয় যেন সেদিন সকাল!

কচ। ঈর্ষাভরে তিনবার দৈত্যগণ মোরে
করিয়াছে বধ, তুমি দেবী দয়া করে'
ফিরায়ে দিয়েছ মোর প্রাণ, সেই কথা
হৃদয়ে জাগায়ে রবে চির-কৃতজ্ঞতা!

দেবযানী। কৃতজ্ঞতা! ভুলে যেয়ো, কোন দুঃখ নাই!
উপকার যা করেছি হয়ে যাক্ ছাই—
নাহি চাই দান প্রতিদান! সুখস্মৃতি
নাহি কিছু মনে? যদি আনন্দের গীতি
কোন দিন বেজে থাকে অন্তরে বাহিরে,
যদি কোন সন্ধ্যাবেলা বেণুমতী তীরে

অধ্যয়ন অবসরে বসি পুষ্পবনে
অপূর্ব্ব পুলকরাশি জেগে থাকে মনে ;
ফুলের সৌরভসম হৃদয়-উচ্ছ্বাস
ব্যাপ্ত করে' দিয়ে থাকে সায়াহ্ন আকাশ,
ফুটন্ত নিকুঞ্জতল, সেই সুখকথা
মনে রেখো—দূর হয়ে যাক্ কৃতজ্ঞতা!
যদি সখা হেথা কেহ গেয়ে থাকে গান
চিত্তে যাহা দিয়েছিল সুখ ; পরিধান
করে' থাকে কোন দিন হেন বস্ত্রখানি
যাহা দেখে মনে তব প্রশংসার বাণী
জেগেছিল, ভেবেছিলে প্রসন্ন অন্তর
তৃপ্ত চোখে, আজি এরে দেখায় সুন্দর ;
সেই কথা মনে কোরো অবসরক্ষণে
সুখস্বর্গধামে! কতদিন এই বনে
দিক্ দিগন্তরে, আষাঢ়ের নীল জটা,
শ্যামস্নিগ্ধ বরষার নবঘনঘটা
নেবেছিল, অবিরল বৃষ্টিজলধারে
কর্ম্মহীন দিনে সঘন কল্পনাভারে
পীড়িত হৃদয় ; এসেছিল কতদিন
অকস্মাৎ বসন্তের বাধাবন্ধহীন
উল্লাস-হিল্লোলাকুল যৌবন-উৎসাহ,
সঙ্গীত-মুখর সেই আবেগপ্রবাহ
লতায় পাতায় পুষ্পে বনে বনান্তরে
ব্যাপ্ত করি দিয়াছিল লহরে লহরে

আনন্দপ্লাবন ; ভেবে দেখ একবার
কত উষা, কত জ্যোৎস্না, কত অন্ধকার
পুষ্পগন্ধঘন অমানিশা, এই বনে
গেছে মিশে সুখে দুঃখে তোমার জীবনে,—
তারি মাঝে হেন প্রাতঃ, হেন সন্ধ্যাবেলা,
হেন মুগ্ধরাত্রি, হেন হৃদয়ের খেলা,
হেন সুখ, হেন মুখ দেয় নাই দেখা
যাহা মনে অাঁকা রবে চির চিত্ররেখা
চিররাত্রি চিরদিন ? শুধু উপকার !
শোভা নহে, প্রীতি নহে, কিছু নহে আর ?

কচ। আর যাহা আছে তাহা প্রকাশের নয়
সখি ! বহে যাহা মর্ম্মমাঝে রক্তময়
বাহিরে তা কেমনে দেখাব ?

দেবযানী। জানি সখে,
তোমার হৃদয় মোর হৃদয়-আলোকে
চকিতে দেখেছি কতবার, শুধু যেন
চক্ষের পলকপাতে ; তাই আজি হেন
স্পর্দ্ধা মোর ! তুমি থাক তবে, থাক তবে,
যেওনাকো ! সুখ নাই যশের গৌরবে !
হেথা বেণুমতীতীরে মোরা দুই জন
অভিনব স্বর্গলোক করিব সৃজন
এ নির্জ্জন বনচ্ছায়া সাথে মিশাইয়া
নিভৃত বিশ্রব্ধ মুগ্ধ দুইখানি হিয়া
নিখিল-বিস্মৃত ! ওগো বন্ধু, আমি জানি
রহস্য তোমার !

কচ। নহে, নহে, দেবযানী!

দেবযানী। নহে? মিথ্যা প্রবঞ্চনা! দেখি নাই আমি
মন তব? জান না কি প্রেম অন্তর্যামী?
বিকশিত পুষ্প থাকে পল্লবে বিলীন,
গন্ধ তার লুকাবে কোথায়? কতদিন
যেমনি তুলেছ মুখ, চেয়েছ যেমনি,
যেমনি শুনেছ তুমি মোর কণ্ঠধ্বনি
অমনি সর্ব্বাঙ্গে তব কম্পিয়াছে হিয়া,—
নড়িলে হীরক যথা পড়ে ঠিকরিয়া
আলোক তাহার! সে কি আমি দেখি নাই?
ধরা পড়িয়াছ বন্ধু বন্দী তুমি তাই
মোর কাছে! এ বন্ধন কাটিতে নারিবে!
ইন্দ্র আর তব ইন্দ্র নহে!

কচ। শুচিস্মিতে,
সহস্র বৎসর ধরি এ দৈত্যপুরীতে
এরি লাগি করেছি সাধনা?

দেবযানী। কেন নহে?
বিদ্যারি লাগিয়া শুধু লোকে দুঃখ সহে
এ জগতে? করেনি কি রমণীর লাগি
কোন নর মহাতপ? পত্নীবর মাগি
করেন নি সম্বরণ তপতীর আশে
প্রখর সূর্য্যের পানে তাকায়ে আকাশে
অনাহারে কঠোর সাধনা কত? হায়,
বিদ্যাই দুর্লভ শুধু, প্রেম কি হেথায়

এতই সুলভ ? সহস্র বৎসর ধরে'
সাধনা করেছ তুমি কি ধনের তরে
আপনি জান না তাহা। বিদ্যা একধারে
আমি একধারে—কভু মোরে কভু তারে
চেয়েছ সোৎসুকে ; তব অনিশ্চিত মন
দোঁহারেই করিয়াছে যত্নে আরাধন
সঙ্গোপনে। আজ মোরা দোঁহে একদিনে
আসিয়াছি ধরা দিতে। লহ সখা চিনে
যারে চাও! বল যদি সরল সাহসে
"বিদ্যায় নাহিক সুখ, নাহি সুখ যশে,
দেবযানী, তুমি শুধু সিদ্ধি মূর্ত্তিমতী,
তোমারেই করিনু বরণ," নাহি ক্ষতি
নাহি কোন লজ্জা তাহে! রমণীর মন
সহস্রবর্ষেরি সখা সাধনার ধন।

কচ। দেব সন্নিধানে শুভে করেছিনু পণ
মহাসঞ্জীবনী বিদ্যা করি' উপার্জ্জন
দেবলোকে ফিরে যাব ; এসেছিনু তাই,
সেই পণ মনে মোর জেগেছে সদাই,
পূর্ণ সেই প্রতিজ্ঞা আমার, চরিতার্থ
এতকাল পরে এ জীবন ; কোন স্বার্থ
করি না কামনা আজি!

দেবযানী। ধিক্ মিথ্যাভাষী!
শুধু বিদ্যা চেয়েছিলে ? গুরুগৃহে আসি
শুধু ছাত্ররূপে তুমি আছিলে নির্জ্জনে
শাস্ত্রগ্রন্থে রাখি আঁখি রত অধ্যয়নে

অহরহ? উদাসীন আর সবা পরে?
ছাড়ি অধ্যয়নশালা বনে বনান্তরে
ফিরিতে পুষ্পের তরে, গাঁথি মালাখানি
সহাস্য প্রফুল্ল মুখে কেন দিতে আনি
এ বিদ্যাহীনারে? এই কি কঠোর ব্রত?
এই তব ব্যবহার বিদ্যার্থীর মত?
প্রভাতে রহিতে অধ্যয়নে, আমি আসি
শূন্য সাজি হাতে লয়ে দাঁড়াতেম হাসি,
তুমি কেন গ্রন্থ রাখি উঠিয়া আসিতে,
প্রফুল্ল শিশিরসিক্ত কুসুমরাশিতে
করিতে আমার পূজা? অপরাহ্নকালে
জলসেক করিতাম তরু-আলবালে,
আমারে হেরিয়া শ্রান্ত কেন দয়া করি'
দিতে জল তুলে? কেন পাঠ পরিহরি
পালন করিতে মোর মৃগশিশুটিকে?
স্বর্গ হতে যে সঙ্গীত এসেছিলে শিখে
কেন তাহা শুনাইতে, সন্ধ্যাবেলা যবে
নদীতীরে অন্ধকার নামিত নীরবে
প্রেমনত নয়নের স্নিগ্ধচ্ছায়াময়
দীর্ঘ পল্লবের মত? আমার হৃদয়
বিদায় নিতে এসে কেন করিলে হরণ
স্বর্গের চাতুরীজালে? বুঝেছি এখন,
আমারে করিয়া বশ পিতার হৃদয়ে
চেয়েছিলে পশিবারে—কৃতকার্য্য হ'য়ে
আজ যাবে মোরে কিছু দিয়ে কৃতজ্ঞতা;

লব্ধমনোরথ অর্থী রাজদ্বারে যথা
দ্বারীহস্তে দিয়ে যায় মুদ্রা দুই চারি
মনের সন্তোষে?—

কচ। হা অভিমানিনী নারী!
সত্য শুনে কি হইবে সুখ? ধর্ম্ম জানে,
প্রতারণা করি নাই; অকপট প্রাণে
আনন্দ অন্তরে তব সাধিয়া সন্তোষ,
সেবিয়া তোমারে যদি করে' থাকি দোষ
তার শাস্তি দিতেছেন বিধি। ছিল মনে
কব না সে কথা। বল কি হইবে জেনে
ত্রিভুবনে কারো যাহে নাই উপকার,
একমাত্র শুধু যাহা নিতান্ত আমার
আপনার কথা। ভালবাসি কি না আজ
সে তর্কে কি ফল? আমার যা আছে কাজ
সে আমি সাধিব। স্বর্গ আর স্বর্গ বলে'
যদি মনে নাহি লাগে, দূর বনতলে
যদি ঘুরে মরে চিত্ত বিদ্ধ মৃগসম,
চিরতৃষ্ণা লেগে থাকে দগ্ধ প্রাণে মম
সর্ব্বকার্য্য মাঝে—তবু চলে যেতে হবে
সুখশূন্য সেই স্বর্গধামে। দেব সবে
এই সঞ্জীবনী বিদ্যা করিয়া প্রদান
নূতন দেবত্ব দিয়া তবে মোর প্রাণ
সার্থক হইবে; তার পূর্ব্বে নাহি মানি
আপনার সুখ। ক্ষম মোরে, দেবযানী,
ক্ষম অপরাধ!

দেবযানী। ক্ষমা কোথা মনে মোর!
করেছ এ নারীচিত্ত কুলিশ-কঠোর
হে ব্রাহ্মণ! তুমি চলে' যাবে স্বর্গলোকে
সগৌরবে, আপনার কর্ত্তব্য-পুলকে
সর্ব্ব দুঃখশোক করি দূর-পরাহত;
আমার কি আছে কাজ, কি আমার ব্রত!
আমার এ প্রতিহত নিষ্ফল জীবনে
কি রহিল, কিসের গৌরব? এই বনে
বসে রব নতশিরে নিঃসঙ্গ একাকী
লক্ষ্যহীনা! যে দিকেই ফিরাইব আঁখি
সহস্র স্মৃতির কাঁটা বিঁধিবে নিষ্ঠুর;
লুকায়ে বক্ষের তলে লজ্জা অতি ক্রূর
বারম্বার করিবে দংশন! ধিক্ ধিক্,
কোথা হতে এলে তুমি, নির্ম্মম পথিক,
বসি মোর জীবনের বনচ্ছায়াতলে
দণ্ড দুই অবসর কাটাবার ছলে
জীবনের সুখগুলি—ফুলের মতন
ছিন্ন করে' নিয়ে—মালা করেছ গ্রন্থন
একখানি সূত্র দিয়ে; যাবার বেলায়
সে মালা নিলে না গলে, পরম হেলায়
সেই সূক্ষ্ম সূত্রখানি দুই ভাগ করে'
ছিঁড়ে দিয়ে গেলে! লুটাইল ধূলিপরে
এ প্রাণের সমস্ত মহিমা! তোমা পরে
এই মোর অভিশাপ—যে বিদ্যার তরে

মোরে কর অবহেলা, সে বিদ্যা তোমার
সম্পূর্ণ হবে না বশ;—তুমি শুধু তার
ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ,
শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ!
কচ। আমি বর দিনু, দেবী, তুমি সুখী হবে!
ভুলে যাবে সর্ব্বগ্লানি বিপুল গৌরবে!

---

# কৃতজ্ঞতা।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

বরেন্দ্রভূমে, পদ্মাতীরে কুণ্ডলা নামে প্রাচীন গ্রাম। ইহার সুখসম্পদের দিনে পদ্মা প্রায় দেড় ক্রোশ দক্ষিণে বহিয়া যাইত, কিন্তু কালে সে ব্যবধান দূর হইয়া গেল। পদ্মার ভাঙ্গনের সঙ্গে সঙ্গে কুণ্ডলার অদৃষ্টও ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল। জমীদার মৈত্রবংশের দুই শাখায় তুমুল মোকদ্দমা বাধিয়া গেলে বড় তরফের বংশধর হরিনাথ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এবং চারি বছরের একটী পুত্র রাখিয়া দেহত্যাগ করিলেন। বিষয়-আশয় সব কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের জিম্মা হইল। ওদিকে ছোট তরফের বাবু প্রমথনাথ খুব উৎসাহে লড়িতে লাগিলেন। মোকদ্দমা জেলা-কোর্ট হইতে হাইকোর্টে, সেখান হইতে প্রিভিকৌন্সিলে দুই পক্ষের বিস্তর অর্থ গ্রাস করিয়া হবিপুষ্ট হুতাশনের মত বাড়িতে বাড়িতে চলিল। কেহ মিটমাটের কথা তুলিলে মৃতদার প্রমথ নাথ বলিতেন, "আমার একটা মেয়ে বই ত আর কেউ নেই, হারি জিতি নাহি লাজ। ভাল দেখাই যাক্ না, শেষ কোথায়?"

বাস্তবিক মেয়েটীর জন্মাবধি দুই সরিকের কলহেরও সুরু এবং তাহার বিবাহের লগ্ন-পত্র, এমন কি "করণ" হইয়া গেলেও সে আগুন নিভিবার কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। সহসা একদিন খবর আসিল, বাক্‌দত্ত পাত্রের মৃত্যু হইয়াছে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলে বাক্‌দত্তা কন্যার পক্ষে ইহা বৈধব্যতুল্য। এইরূপ অপরিণীতা বিধবাদের জন্ম নিকৃষ্ট বিবাহ চলিত আছে বটে, কিন্তু সমাজে সেটা বড় হেয়। তাঁহার আদরের সুরবালা পতিতা হইবে ইহা ভাবিতে প্রমথনাথ অবসন্ন হইতেন। তার পর বছর ফিরিতে না ফিরিতে সম্বাদ আসিল, প্রিভিকৌন্সিলে বড় তরফের জিৎ হইয়াছে। আর সহিল না। ভগ্নহৃদয়ে প্রমথনাথ এ সংসার ত্যাগ করিয়া গেলেন।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বার বছর বয়সে সুরবালা পিতৃহীনা হইল। সমাজের আইনে বিবাহ না হইতেই তার আগে তাহার বৈধব্য ঘটিয়াছিল। পিতা নগদ অর্থ কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, ভূমিসম্পত্তি যথেষ্ট থাকিলেও মোকদ্দমা-খরচার দায়ে সর্ব্বস্ব যায় যায় হইল। পরামর্শ দিবার বড় কেহ ছিল না। পিতার আমলের কর্ম্মচারীরা বেগতিক দেখিয়া ক্রমে ক্রমে সকলেই সরিয়া পড়িল—কেন না, তাহারা বুঝিল অতঃপর বড় তরফের সঙ্গে শত্রুতা রাখিলে তাহাদিগকে সে অঞ্চলে বসবাস উঠাইতে হইবে। দুটি লোক কেবল ততটা হিসাব করিয়া চলিতে পারিল না—তার একটা প্রমথনাথের জমাদার অকালীসিং, অপরা ভগবতী নামে দাসী, সে সুরবালাকে মানুষ করিয়াছিল।

অবস্থা যখন এইরূপ তখন কাহাকেও কিছু না বলিয়া একদিন অকালীসিং জেলার সদরে গিয়া কালেক্টর সাহেবের কাছে দরখাস্ত দিল। মোক্তার বলিল যে, তাহার যখন আম-মোক্তারনামা কি কোন রকমের ক্ষমতাপত্র নাই, তখন নাবালিকার পক্ষে সে কোন দরখাস্ত দিলে নামঞ্জুর হইয়া যাইবে। অকালীসিং সে কথা না বুঝিয়া বিচিত্র হিন্দী বাঙ্গলায় মোক্তারকে বলিল যে, সে যাহা যাহা বলিতেছে, তাহারই ঠিক্ এবারতে তিনি দরখাস্ত লিখিয়া দিন, মঞ্জুরি বা নামঞ্জুরি সম্বন্ধে কালেক্টর সাহেবের সঙ্গে তার বোঝাপড়া আছে। দীর্ঘমূর্ত্তি, পাকা জুলপিদার ভোজপুরিয়াটা এই কথা বলিয়া মোক্তার সাহেবের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্থাপন করিলে, তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ঠিক্ তাহার কথাগুলি দরখাস্তে বসাইয়া দিলেন এবং পূর্ব্বে কস্মিনকালে পরিচয় না থাকিলেও সনাক্ত করিলেন "জানি চিনি।" সেই তীক্ষ্ণকটাক্ষ মোক্তার মহাশয়ের হৃদয়ে এমনই বিঁধিয়া গিয়াছিল যে, এত করিয়াও তিনি অকালী সিংহের কাছে নিজের প্রাপ্য গণ্ডা বুঝিয়া লইতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। অকালী কিন্তু নিজে হইতে তাঁহাকে এক টাকার জায়গায় দুই টাকা দিয়া স্মিতমুখে সুধাইল, "ক্যা বাবুসাহাব খুসী হুয়া না ?"

"সওয়ালযানির সময় সকলের আগে অকালী সিং কালেক্টর সাহেবের সমীপবর্ত্তী হইল। কালেক্টর ডোনল্ড্ সাহেব তখন মাথা গুঁজিয়া লিখিতেছিলেন; চশমাচক্ষে এজলাসের নীচে চাহিবামাত্র নিজ পরিচিত একঘর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন লোকের মধ্যে একটা মানুষের মতন মানুষ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। কাজেই তিনি সর্ব্বাগ্রে অকালী সিংকে ডাকিয়া তাহার নালিশটা কি শুনিতে ব্যস্ত হইলেন। অকালী সুশিক্ষিত সৈন্যের মত

গ্রীবা উন্নত করিয়া সাহেবকে সেলাম করিল এবং দৃঢ়হস্তে তাঁহাকে দরখাস্তখানি দিল।

সাহেব দরখাস্তের উপর চক্ষু বুলাইয়া লইয়া পেস্কারকে পড়িতে বলিলেন। এবং সকল শুনিয়া অকালী সিংহকে সুধাইলেন যে, নাবালিকার পক্ষে তাহার কোন ক্ষমতাপত্র আছে কি না?

অকালী সিং এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল বটে, কিন্তু সহসা "না" বলিতে একটু ইতস্ততঃ করিল। বলিল সে এবং এক দাসী ছাড়া এই বালিকার এ সংসারে আর কেহ নাই। হরানন্দ তালুকদার বড়তরফের মোক্তার এজলাসে উপস্থিত ছিলেন, দরখাস্তপাঠ শেষ হইলে বুঝিলেন ব্যাপারখানা কি? অমনি পেশকারের সঙ্গে তাঁহার চোকের কোণে কি কথাবার্ত্তা হইয়া গেল। হিন্দুস্থানীটা সাহেব বাহাদুরের কথায় ঠিক উত্তর দিল না দেখিয়া পেশকার হাঁকিলেন "যো বাৎ পুছা গিয়া উস্‌কা সাফ্ জবাব করো।" সাহেব বলিলেন "আচ্ছা বলিতে দাও।" অকালী উৎসাহিত হইয়া বলিল, "না ক্ষমতাপত্র নাই। আমার মৃত মনিব তাঁহার একমাত্র কন্যাকে আমার হাতে সমর্পণ করিয়া গেছেন। নারায়ণ জানেন সেই আমার ক্ষমতাপত্র।" তাহার সুস্পষ্ট কণ্ঠে সেই কয়টা কথা শিক্ষিত বাগ্মীর মত শুনাইল। ডোনাল্ড্ মনে মনে বক্তার প্রভুভক্তির প্রশংসা করিলেন।

সাহেব বলিলেন, "অকালী সিং তোমার মনিব বলিতেছ বালিকামাত্র, আমার সমক্ষে তাঁহাকে আনিতে পার?"

অকালী একটু ভাবিল বটে, কিন্তু মুহূর্ত্তে উত্তর দিল, "হুজুর তিনি বালিকা হইলেও বড়ঘরণা, আপনার কাছে আসিতে তাঁর ইজ্জতের হানি হইবে। এখন যে আপনার মরজি।"

কালেক্টর দরখাস্তে হুকুম লিখিলেন। হাসিয়া বলিলেন,

"আচ্ছা আমি শীঘ্র মেমসাহেবকে লইয়া তোমার মনিবকে দেখিতে যাব। আজ তুমি যাও। পূর্ব্বাহ্ণে খবর পাইবে।" অকালী সেলাম করিতে না করিতে সাহেব তাহাকে অভিবাদন করিলেন। হরানন্দ তালুকদার উকীল কামিনী বাবুর কানে কানে বলিলেন, "ঐ গো, মেড়ুয়াবাদীটে জমকাল চেহারায় সাহেব ভুলাইয়া গেল!"

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

স্নান করিয়া সামান্য "ফুটাহা" খাইয়াই অকালী সিং অতঃপর গৃহে ফিরিল—কেন না, কার্য্যোদ্ধার হইয়া গেলে "সুরো দিদির" অশ্রুসিক্ত মুখখানি মনে পড়িয়া যাওয়াতে কিছুই তাহার আর ভাল লাগিতেছিল না। অতি প্রত্যূষে ভগবতী দাসী শয্যাত্যাগ করিবার আগেই লাটির মাথায় বস্ত্রখণ্ড এবং "আঙ্গোছা" বাঁধিয়া লইয়া অকালী জমাদার নিঃশব্দে "দেউড়ী" ছাড়িয়া গিয়াছিল। "জেনানার" পেটে কথা থাকে না, এই ধ্রুব বিশ্বাসে জমাদার মনিবের চিরসুখদুঃখভাগিনী "ভগী"কেও পেটের কোন কথা ভাঙ্গিয়া বলা কর্ত্তব্য জ্ঞান করে নাই। অতএব অকালী সিং কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইয়া পথ চলিতেছিল।

এদিকে অকালী সিংএর অনুপস্থিতিতে ছোট তরফের সেই প্রায় জনশূন্য বৃহৎ বাটী আজ সমস্ত দিন আরও নির্জ্জন মনে হইতেছিল এবং তাহার সেই ক্ষুদে মনিবটী নানা উক্তিলায় হুলুস্থূল বাধাইতেছিল। প্রহরবেলা উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও যখন অন্দর হইতে "দেউড়ী"র দিকে দুইবার আসিয়া সুরবালা জমাদারকে দেখিতে পাইল না, তখন ভগী দাসীর কাজকর্ম্ম বন্ধ হইবার

যোগাড় হইল। ভগী যত বলে "সে তাকে বলে যায় নি, হয় ত কোন মাহালে গেছে" সুরবালার ক্ষুদ্র হাতের অজস্র কিল চাপড় তত তার পৃষ্ঠে এবং গণ্ডে বর্ষিত হয়। দুই প্রহর উত্তীর্ণ হইলে বালিকা চোকের জলে ভাসিতে ভাসিতে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল, বামুন ঠাকুরাণী স্নানাহারের জন্য অনুরোধ করিতে আসিলে "জবাব" লাভ করিল। "আমি বিধবা মানুষ, আপনি রেঁধে খাব, তুমি আমার রাঁধতে এসো কেন গা? জমাদার যদি আবার ফিরে আসে তবে তোমাদের সবাইকে মজা দেখাব।" ভগী দাসী বলিল, "যুয়ায়না কুকি, অমন অলক্ষণে কথা মুখে এনো না। ষাট, ষাট, আপনাকে বিধবা বলে' গাল দিতে নেই। তোমার বিয়েই হয় নি, অমন কত হয়!" এ কথায় সুরবালা ক্ষুদ্র সিংহিনীর মত গর্জ্জিয়া উঠিল এবং আপনার আলুলায়িত কুন্তল-দাম বাঁধিতে বাঁধিতে ভগীকে দু কথা শুনাইয়া দিল।—"মর, আমি কি না তোর মতন কৈবর্ত্তের মেয়ে তাই আবার বিয়ে হবে!" ভগী সে কথা গ্রাহ্য না করিয়া তার আদরের সুরোর অসংযমিত কেশরাশির ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিল এবং জানালা হইতে সুবাসিত তৈল লইয়া তাহা নিষিক্ত করিতে করিতে বলিল, "কেন কুকি হরি সান্যালের বেটীর ত আবার বিয়ে হয়েচে, এবার শুনচি ছেলেও হবে!" আয়ত চক্ষুদুটিকে আয়তত্তর করিয়া বালিকা জানালাস্থিত তৈলবাটিকায় পদাঘাত করিল এবং দাসীর হাত হইতে সজোরে আপনার চুলগুলি টানিয়া লইল। বলিল, "সে শতেকখোয়ারীর কথা আমার সাম্‌নে তুই বল্‌তে পাবিনে।" ভগী হাসিয়া বলিল "আচ্ছা তাই হবে, আর বল্‌ব না।" সুরবালা তাহার হাসি দেখিয়া আরও জ্বলিয়া গেল এবং ভগী দাসীকে শাসাইল জমাদার ফিরে এলে মজা দেখাবে।

বেলা পড়িয়া আসিলে হঠাৎ সুরোর মনে হইল হয় ত বড় তরকের লোকেরা তাহার জমাদারকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। এই কথাটায় তাহার এমনি বিশ্বাস হইল যে, সে ভগীকে কাছে ডাকিয়া তাহার কানে কানে অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক মাথামুণ্ডু পরামর্শ করিল। সুরোর বুদ্ধিশুদ্ধির উপর বুদ্ধিমতী শ্রীমতী ভগবতী দাসীর আঠার আনা নির্ভর, অতএব সে "তা হবে" বলিয়া তাহার ছল ছল বড় বড় চোখ দুটির উপর অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

উভয়ের যখন এই অবস্থা, অকালী সিং তখন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বিস্ময়ের প্রথম মুহূর্ত্ত অতীত হইলে সুরবালা জমাদারের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ভগী বলিল, "ছি, কুকি, এখন বড় হতে চল্‌লে—এখন আর ওসব যুয়ায় না কুকি"।

ক্রমশঃ

---

## পৌষ-পার্ব্বণ।

গাঙ্গুলিদের নলিনী সবেমাত্র তের বছরে পড়িয়াছে, ২রা মাঘ তার দ্বিরাগমনের দিন স্থির করিয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণী ২০শে পৌষ চিঠি লিখিয়াছিলেন। নলিনীর শ্বশুর নাই কিন্তু লোকে বলে যখন ছিলেন তখনও গৃহিণীর মন্ত্রীত্বে তাঁহার সংসার-রাজ্যটুকু চলিত। অতএব নলিনীর কেরাণী স্বামী ফণীভূষণ এবং তাহার নাবালক ভাইবোনগুলির একমাত্র অভিভাবিকা এই মাতা ঠাকুরাণী। নলিনীর পিতা উত্তরে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত "মহলৎ" ভিক্ষা করায় বেহাইন দরখাস্ত নামঞ্জুর ত করিলেনই উপরন্তু লিখিয়া পাঠাইলেন ২রা মাঘ বধূমাতাকে না পাঠাইলে

তিনি ফাল্গুন মাসে ফণীর আবার বিয়ে দিবেন। নলিনীর মা নিতান্ত সাধাসিধে রকমের লোক হইলেও এ অপমানে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং বেহাইন মাগীর উদ্দেশে নাক তুলিয়া তুলিয়া নানা কথার মধ্যে বলিয়া বসিলেন, "তা বিয়ে দ্যায় দিক্ না, আমার মেয়ে কিছু ভেসে এসেনি" ইত্যাদি। নলিনী তখন কাছে বসিয়া মাথা হেঁট করিয়া নিতান্ত অপরাধিনীর মত নখে মাটী খুঁড়িতেছিল, আর মাথামুণ্ড কি ভাবিতেছিল তা সেই জানে, কিন্তু আট বছরের বোন স্থুরি বলিয়া উঠিল,—

"শ্বশুরবাড়ী যেতে যেতে হেসে বলেন ধনী,
দাঁড়ায়ে বেহারা মিন্‌সে মার কান্না শুনি।
মা বড় নির্ব্বোধ কেঁদে কেন মর
আপুনি ভাবিয়ে দ্যাখ কার্ ঘর কর"।

শুনিয়া মা পিসি এবং পাড়ার ঠান্‌দিদি রাগ ভুলিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং জোড়া জোড়া চোক এককালে নলিনীর হেঁট মুখখানির উপর পড়িল। নলিনী কাঁদিয়া ফেলিল এবং আঁচল লুটাইতে লুটাইতে স্থুরিকে মারিতে দৌড়িল।

মেয়ে-মহলের রুদ্ররস এইরূপে হাস্যরসে শীতল হইলেও নলিনীর বাপের আকাশপাতাল ভাবনা-বহ্নি দিনমান ধিকিধিকি জ্বলিতে লাগিল। চারিটে মেয়ের ভেতর দুটোকে পার করিয়াছেন, নলিনীর দ্বিরাগমন ভালোয় ভালোয় মিটিয়া গেলে তিন কন্যাদায় হইতে একরকম নিষ্কৃতি পান। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বেহান মাগীটে ভারি বাঁকা রকমের লোক, জিনিসপত্তর কিছুই কখন তার পছন্দ হয় না। গৃহিণীকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি একটু নাক তুলিয়া নথ নাড়িয়া বলিলেন, "মরুক, সমুদ্দ রে া, তার শিশিরে কি হবে? সে ছোট লোককে কিছুতেই

খুসী করা যাবে না। ঘরে পুরোণ বাসুনকোসুন আছে, তাই দেব।" কর্ত্তা জিভ্ কাটিয়া বলিলেন "সেটা কি ভাল হয়?" গিন্নি অপ্রতিভের হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "তা তুমি যা ভাল বুঝবে, তাই করো। তোমার চেয়ে কি আমাদের বেশী বুদ্ধি গা? কথায় বলে, বারহাত কাপড়ে কাছা নেই!"

অতএব স্বামীর ভাবনা তাঁহাতেই রাখিয়া গৃহিনী ঠাকুরাণী এবার একটু জাঁকাল রকমের পৌষ-পার্ব্বণ করিবার দিকে মন দিলেন। সেই দিন দুপুর বেলায় চাল কোটার ধুম পড়িয়া গেল। তাহার ফলে পাড়ার সূত্রধরকন্যা রোহিণীর "ঢেঁকিশালের" মাহাত্ম্য বাড়িয়া গেল—কেন না, পাড়ার মধ্যে সেই মোটে একটা ঢেঁকি। রোহিণী যখন বিধুর মার সঙ্গে একজোট হইয়া ঢেঁকিতে "পার" দেয়, তখন ঢেঁকি একরকম একটানা সুরে, বাঁধাবাঁধি তালে আপনার করুণ দশা সংসারে ঘোষিত করে এবং তাহা হইতেই ভাবুক ভাবিনীরা কল্পনা করিয়াছেন যে, "ঢেঁকি বেচারীর স্বর্গেও সুখ নেই।" কিন্তু সত্যসত্যই কি তাই? অন্ততঃ পৌষ-পার্ব্বণের এই কটাদিন ঢেঁকির জীবনে দুর্গোৎসব। আলতাপরা মল-পরিহিত চরণকমলগুলি যখন তার কাঠের দেহে জোরে জোরে বেতালে স্বর্গের কুসুমরাশির মত বর্ষিত হয়, তখন অনভ্যাসের বেতালা রাগে ঢেঁকির আনন্দ-গানপাড়া মাৎ করিয়া তোলে। পুরুষ-পাঠকের ভিতর যদি কেহ কখন গৃহিণীর কাছে আদরের "ঢেঁকি" সম্বোধন শুনিয়া কৃতার্থ হন, তিনি অতঃপর বলিতে পারেন, "ঠাক্রুণ তোমার আশীর্ব্বাদে আমার যেন পৌষ-পার্ব্বণের ঢেঁকি জন্মলাভ হয়।"

নলিনী শ্বশুরবাড়ী যাবে, অতএব লক্ষ্মীপূজার আলিপনা দিবার ভারটা তাহার উপরেই পড়িয়াছে। সে ভারটার দ

অনুভব করিয়া বালিকা কিছু ব্যতিব্যস্ত এবং সেইজন্যই ঢেঁকি-শাল হইতে খুব শীঘ্র তাহাকে এবং তার বেগুণ ফুল প্রমদাকে চলিয়া আসিতে হইয়াছে। দক্ষিণ-দ্বারী ঘরের পরিষ্কৃত দেওয়ালের গায় যেখানে তাহারা দুজনে "এলুন" দিতে তন্ময়, সেখানে আর কেহ ছিল না। পিসিমা ততক্ষণ মাঝে মাঝে আসিয়া "এলুনে"র দোষগুণ বিচার করিতেছিলেন, কিন্তু "তিল কোটার" হাঙ্গামায় তাঁহাকেও চলিয়া যাইতে হইল। পিসি বলিয়া গেলেন "অত তাড়াতাড়ি করিস্‌নে নলু, বেশ হচ্চে। বেয়ান মাগীর চোক থাকে ত তোর এলুন দেওয়া দেখে জুড়োবে।" বেগুন ফুলকে একলা পাইয়া প্রমদা আল্পিপনার চিত্রিত বিহঙ্গদম্পতির উপর আপনার সুন্দর অঙ্গুলি ছুটি রাখিয়া বলিল, "এইটা ফণী আর এইটী ননী"। নলিনী আদরের ব্যাকরণানুসারে প্রমদার কাছে "ননী" হইয়া যাওয়ায়, বেগুনফুলের গাল টিপিয়া দিল এবং তাহাকে ভয় দেখাইল "ফের যদি অমন কথা বল্‌বি, পাখী দুটোকে পুঁছে দেব!" তার পর দুই সইয়ের সুখদুঃখের গল্প এতই জমিয়া গেল, যে, একপ্রহর পরে ফিরিয়া আসিয়া পিসি দেখিলেন তাঁহার সুবুদ্ধি ভ্রাতুষ্কন্যা আর আদৌ তাড়াতাড়ি করে নাই।

নলিনীতে আর প্রমদাতে মিলিয়া দেওয়ালের আলিপনা সম্পূর্ণ করিয়া আঙ্গিনার আলিপনায় মন দিল। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রাচীরবেষ্টিত বৃহৎ অন্দরের উঠান শ্বেত সুন্দর চিত্ররাজিতে ভরিয়া গেল। লতাপাতার পদ্ম কদম্ব ফুলে, ময়ূর শুক পক্ষীর সুন্দর কণ্ঠে, মালক্ষ্মীর চরণযুগল সর্ব্বত্র শোভা পাইতে লাগিল। বহির্ব্বাটীর উঠানও, অত না হউক্ সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইল না। স্বয়ং পিসিমা ধানের গোলার নীচে শতদল

আঁকিয়া তাহার শিরোদেশে কমলার নূপুরভূষিত চরণযুগল আঁকিয়া দিলেন। সন্ধ্যার পর চাঁদ উঠিলে সেই শ্বেত চিত্রাবলী কিরণহিল্লোলে সজীব হইয়া উঠিল—সেই লক্ষ্মীর পা, সকমল মৃণালের দল এক একবার শ্বেতসর্প বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল।

লক্ষ্মীপূজার দিন ভোরে স্নান করিয়া পিসিমা লক্ষ্মী সাজাইতে বসিয়া গিয়াছেন আর নলিনীর মা চূর্ণিত চাউল ও মুদ্গপিণ্ড প্রভৃতিতে বেষ্টিত হইয়া রন্ধনশালা সার করিয়াছেন। নলিনীর চিত্রিত দক্ষিণদ্বারী ঘরের সেই দেওয়ালের নীচে ধানের রাশির উপর লালচেলীপরিহিতা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী বসিয়াছেন—দুই পার্শ্বে ধনধান্যের চিরশত্রু মূষিককুলসূদন পেচকদম্পতি বসিয়া তাঁর আদর লাভ করিতেছে, সম্মুখে পার্শ্বে সর্ব্বত্র সুখ-সম্পদের নিদর্শনস্বরূপ সমুদ্রশম্বুকগুলি সজ্জিত আছে। ধূপ-ধুনার গন্ধে লক্ষ্মীগৃহ পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে। পুরোহিত ঠাকুর পূজা শেষ করিয়া গেলে শাঁখা-হাতে অরুন্ধতী ঠাকুরুণ লক্ষ্মীর কথা বলিতে আসিলেন। কথা না শুনিলে বাড়ীর বউঝিদের জলস্পর্শ করা হইবে না। অতএব ঠাকুরাণী শ্বেত-সীমন্তে একরাশ সিন্দূর পরিয়া এবং বউঝিদের পরাইয়া কথা আরম্ভ করিলেন, তার সংক্ষেপ এইরূপ।—

মালক্ষ্মীর ছেলের নাম ধনকুবের, মেয়ের নাম ধূসনা। পৌষ-সংক্রান্তির সময় মেয়ে যখন শশুরালয়ে, তখন লক্ষ্মীর সাধ হইল আপনার ভক্তদের একবার ভক্তি পরীক্ষায় ফেলিবেন। পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, এই নাও পাঁচ মোহর আর এই নাও একটু কার্পাসের তুলো। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ঘুরিয়া এস, আজ আমার পূজার দিনে ঘরে ঘরে ফিরিয়া দেখ এই পাঁচ মোহরের লোভে কেউ তুলা পিঁজিতে রাজি হয় কি না। ধনকুবের মাতৃ-

আজ্ঞায় ছদ্মবেশে ত্রিভুবন ঘুরিলেন, যাকে সেই সুবর্ণ মুদ্রার লোভ দেখাইয়া তুলা পিঁজিতে আহ্বান করেন, সেই তাঁহাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়। শেষে পরিশ্রান্ত হইয়া ভগ্নী ধূসনার গৃহে গেলেন। মাতার আদেশ শুনিয়া ধূসনা ভাইকে বলিল "তা বেশ আমি ও তুলোটুকু পিঁজে দিই তুই আমার ধনাগারে মোহর পাঁচখান রেখে দে।" ধনকুবেরের মুখে কন্যার কার্য্যবিবরণ শুনিয়া লক্ষ্মী ক্রোধ করিলেন এবং ধনগর্ব্বে মত্ত হইয়া তাঁহার পূজার দিনে তুলা পিঁজিয়া তাঁহার অপমান করিয়াছে ভাবিয়া তাহাকে দারুণ দারিদ্র্যে ফেলিলেন। নিরুপায় হইয়া ধূসনা মাতার পুষ্প আহরণকারিণী মালিনীর কাছে গেল এবং লক্ষ্মীর প্রসাদলাভাকাঙ্ক্ষার উপযাচিকা হইয়া একদিন সুন্দর সুবাসিত ফুলে মালা গাঁথিয়া আপনার নাম লিখিয়া দিল। দেখিয়া মা, মালিনীকে বলিলেন, বাড়ী গিয়া তাকে দূর করিয়া দে। লক্ষ্মীর ধোপানীর কাছে গিয়া ধূসনা একদিন এমন পরিকার করিয়া মাতার কাপড়গুলি কাচিয়া দিল যে, তাহা রজকের অসাধ্য বুঝিয়া মাতা ধোপানীকে আজ্ঞা দিলেন, কাপড় যে কেচেছে, বাড়ী গিয়াই তাহাকে তাড়াইয়া দিস্। ধূসনার আর দিন যায় না। ধনকুবের মাকে অনুনয় করিয়া বলিলেন, মা তোমারই ত মেয়ে, তাকে এবার ক্ষমা কর। ধূসনা আসিলে শিখাইয়া দিলেন, "দিদি মার কাছ থেকে তাঁর হাতঝাঁপি আর একটু মুখের পান চাস্, তোর দুঃখ দূর হবে।" তাহাই হইল। মায়ে ঝিয়ে আবার ভাব হইল। সেই অবধি, ধূসনা ধনেপুতে লক্ষেশ্বরী হইয়া আছে।

এই কথা যখন শেষ হইয়া গেল, তখন বেলা প্রায় আড়াই প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। লক্ষ্মীর বংশধাত্রী সীমন্তিনীগণ স্বামী-

পুত্রদের পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া আপনারা সেই রাশী-কৃত পিঠেপুলি সরুচাকুলি এবং নলেনগুড়ের পায়েসের প্রতি যথেষ্ট সুবিচার করিলেন, তা বলিয়া তাঁরা যে দীনদুঃখীকে ভুলিয়া গেলেন তাহা নহে। কাহারও কাহারও পাতের নীচে আসিয়া ক্ষুদ্র পিপীলিকারা কাঁদিয়া ফিরিলেও, রন্ধনভাণ্ডার সে দিন অক্ষয়, গ্রামের গরিবের সন্তানবর্গ পেট ভরিয়া পিঠে খাইয়া গেল।

অপরাহ্নে গ্রামে যুবা এবং ছেলের দল গুলিদাণ্ডা খেলিল। গ্রামের বাহিরে প্রশস্ত তৃণশোভিত প্রান্তরে ভদ্রে এবং অভদ্রে একপ্রাণ হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে, গুলি ডাকিতেছে পোঁ পোঁ পোঁ, ছেলেরা বিজয়ীদলের উৎসাহ বাড়াইয়া আনন্দে করতালি দিতেছে, পৌষসংক্রান্তির এ দৃশ্য বাঙ্গালায় এখন আর তত সুলভ নহে।

সন্ধ্যার সময় লক্ষ্মীর আরতি শেষ করিয়া পুরোহিত ঠাকুর তাঁহার গলায় "বাঁউড়ি" বাঁধিলেন, ভরসা চঞ্চলা কমলা সে বন্ধনে ভক্তগৃহে অচলা হইবেন। এই "বাঁউড়ির" একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। গৃহস্থের ধান্য কর্ত্তনের প্রথম দিনে সর্ব্বপ্রথমে যে আটি কাটা হইয়া থাকে, তাহাই বাঁউড়ির প্রসূতি। গৃহিণীরা ভাবেন সেই "বাঁউড়ি"র বন্ধন মা লক্ষ্মীর বড় আদরের জিনিস। তাই তাঁরা পৌষসংক্রান্তির শেষ রাত্রে, লক্ষ্মীমাসের অন্তিম ক্ষণে গোময়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া স্বহস্তে তাহাতে "বাঁউড়ি" বাঁধেন এবং সর্ষপ পুষ্পে পূজা শেষ করিয়া সকলে আগ্রহে বলেন—

"এস পৌষ যেয়োনা
জন্ম জন্ম ছেড়োনা।"

---

# মোগল রাজপত্নী।

পৌষ মাসের সাধনায় শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন মুসলমান বাদসাহদিগের হিন্দুপত্নীগ্রহণের বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন, "মুসলমান বাদসাহারা ভারতের উপর অন্যূন সাত আটশত বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন, ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে কেবল এইমাত্র যে, কয়েকজন মুসলমান বাদসা এই দেশে বিবাহসূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন। মোগলেরা যে, এত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন, ইহাই তাহার প্রধান কারণ। আকবর প্রথম দৃষ্টান্ত দেখান। সেই দৃষ্টান্ত তাঁহার পুত্র পৌত্র, প্রপৌত্রেরা সকলেই অনুকরণ করিয়াছিলেন।" স্থলান্তরে লিখিত হইয়াছে, "মুসলমান বাদসাদিগের একটি সুবিধা ছিল, যাহা ইংরাজদিগের নাই। তাঁহারা অনেকগুলি বিবাহ করিতে পারিতেন। একজন বাদসাই অনেকগুলি বড় বড় হিন্দু রাজাদিগকে আপনার লোক করিয়া ফেলিতেন। ইহাতে যে, দেশসুদ্ধ লোক তাঁহাদিগের অনুগত হইয়াছিল তাহার আর আশ্চর্য্য কি।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, কেবল হিন্দু মুসলমানে বৈবাহিক সম্বন্ধ থাকাতে সাত আটশত বৎসর কাল ভারতে মুসলমান রাজত্ব স্থায়ী ছিল। ইংরেজ যদি বহুবিবাহের পক্ষপাতী হইতেন, হিন্দু ভূপতিদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারাও ভারতের হিন্দুরাজগণকে আপনার লোক করিয়া ফেলিতে পারিতেন। সমগ্র ভারতবাসী মুসলমানের অনুগত হইয়াছিল, যেহেতু মুসলমান ও হিন্দু সুদৃঢ় বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ ছিল।

বিষয়টি বিচার্য্য। ইতিহাসের আলোচনা করিলে দেখা যায়,

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দিল্লীর রত্নসিংহাসন পাঠান ভূপতির অধিকৃত হয়। দৃশদ্বতীর তীরে যখন ভারতের অদৃষ্টচক্র অধোগামী হয়, তখন মহম্মদগোরী দিল্লীর সিংহাসন গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার ক্রীতদাস ও সেনাপতি কোতবদ্দীন তদীয় মৃত্যুর পর দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। ১২০৬ অব্দ হইতে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ তিন শত বৎসরের অধিক কাল ভারতবর্ষে পাঠান ভূপতিদিগের রাজত্ব অব্যাহত থাকে। এই মুসলমান ভূপতিগণ হিন্দুদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে অগ্রসর হয়েন নাই; হিন্দুও জাতীয় গৌরবে বিসর্জ্জন দিয়া, মুসলমানের সহিত সম্মিলিত হইতে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই।

পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে জয়ী হইয়া বাবরশাহ দিল্লীতে আধিপত্য স্থাপন করেন। তিনি ভারতবর্ষে মোগলের প্রাধান্য স্থাপন করিলেও বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়েন নাই। তদীয় পৌত্র ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া ইতিহাসে গৌরবান্বিত হইয়াছেন। আকবর ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে দিল্লীর সম্রাট হয়েন। এতদিন ভারতবর্ষ অনেকগুলি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মুসলমান বা হিন্দু ভূপতিগণ স্বতন্ত্রতা রক্ষণ করিতেছিলেন। আকবরের বাহুবলে ও রাজনীতি-কৌশলে ঐ সকল বিচ্ছিন্ন রাজ্য একীভূত হয়। আওরাঙ্গজেবের মৃত্যুর পর, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধোগতি হইতে থাকে। শেষে ঐ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে উহা অনন্তকালস্রোতে বিলীন হয়। যে রাজশক্তি এক সময়ে আফগানিস্থানের পার্ব্বত্য প্রদেশে, পঞ্চনদের প্রশস্তক্ষেত্রে, বাঙ্গালা ও বিহারের শ্যামল ভূমিতে এবং সুদূর দক্ষিণা-পথের

বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে অপ্রতিহত ছিল, তাহা প্রায় দুই শত বৎসরের মধ্যে অন্তর্হিত হয়।

মুসলমান ভারতবর্ষে পাঁচ ছয় শত বৎসর আধিপত্য করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে পাঠানেরা তিন শত বৎসরের অধিক কাল রাজত্ব করেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহারা হিন্দুর সহিত বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েন নাই। হিন্দু ও মুসলমান একক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া, কুটুম্বভাবে পরস্পর সম্ভাষণ করেন নাই। মোগলসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আকবর হিন্দুনারীকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করেন। তাঁহার সময় হইতে হিন্দু, মুসলমানের কুটুম্ব বলিয়া পরিগণিত হয়েন। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পরিণয়জনিত দুশ্ছেদ্য বন্ধন থাকিলেও আকবরের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য দুইশত বৎসরের অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। আকবর হিন্দুর বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া, স্বীয় সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, হিন্দু ও মুসলমানের রক্ত এক করিয়া জগতে অপূর্ব্ব সমদর্শিতার পরিচয় দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন; শেষে হিন্দুই তাঁহার সেই সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের সুদৃঢ় ভিত্তির ধ্বংসসাধনে উদ্যত হয়। সুতরাং আকবর যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, সে উপায়ে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যরক্ষণ হয় নাই। তিনি অপূর্ব্ব কৌশল বা অসামান্য চাতুরীর সহিত হিন্দুকে মুসলমান করিয়া, আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশে যত্নশীল হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কার্য্যে, তাঁহার প্রবর্ত্তিত দৃষ্টান্তে, তাঁহার সেই অপূর্ব্ব কৌশল বা অসামান্য চাতুরীতে তদীয় মাহাত্ম্য বর্দ্ধিত হয় নাই। ভারতের সমগ্র হিন্দু তাঁহার সহিত এক হইয়া যায় নাই। সমগ্র হিন্দুসমাজও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে নাই বা তাঁহার মোহিনী মন্ত্রশক্তিতে বিমুগ্ধ হইয়া জাতীয় ভাবে বিসর্জ্জন দেয় নাই।

আকবর পরাক্রান্ত সম্রাট। ক্ষমতায়, বৈভবে, প্রতাপে কেহই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। চন্দ্রগুপ্ত বা অশোক, হর্ষবৰ্দ্ধন শিলাদিত্য বা দ্বিতীয় পুলকেশী একসময়ে ভারতবর্ষে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও সর্ব্ববিষয়ে আকবরের ক্ষমতাস্পৰ্দ্ধী হইতে পারেন না। আকবর যেরূপ সৌম্যদর্শন, সেইরূপ শক্তিসম্পন্ন; যেরূপ প্রতাপান্বিত, সেইরূপ পণ্ডিতভক্ত; যেরূপ সমৃদ্ধিশালী, সেইরূপ সর্ব্বজাতির সর্ব্বশ্রেণীর অধিগম্য ছিলেন। যুদ্ধে তাঁহার অসামান্য বীরত্ব, মৃগয়ায় বা রাজসভায় তাঁহার অতুল্য সমৃদ্ধি, সাম্রাজ্যসাধনে তাঁহার অপূর্ব্ব দক্ষতা, ধর্ম্মতত্ত্বের বিচারে তাঁহার অনির্ব্বচনীয় উদারভাব দেখিয়া লোকে বিস্ময় প্রকাশ করিত। আকবর যখন বাহিরে উদারতা ও সমদর্শিতার পরিচয় দিয়া জনসাধারণকে বিমোহিত করেন, তখন তাঁহার কৌশল বা চাতুরী প্রকাশের সুবিধা ঘটে। তিনি হিন্দুর চিরন্তন আভিজাত্যগৌরব, পরিশুদ্ধ জাতীয় ভাবের উপর প্রাধান্য প্রকাশ করিয়া, হিন্দুকে আপনার পদানত করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি আকবর বুঝিয়াছিলেন, হিন্দু সর্ব্ববিষয়ে জগতে অতুলনীয়। হিন্দুর অকলঙ্ক সভ্যতা আছে, জ্ঞান গরিমার ভিত্তিস্বরূপ দর্শনশাস্ত্র আছে, অনন্ত রত্নের আকর মহাকাব্য আছে, আভিজাত্যের উদ্দীপনাময় অপূর্ব্ব বীরত্ব ও তেজস্বিতা আছে। এই উদ্দীপনাস্রোত নিরুদ্ধ করাই আকবরের উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দু আপনার হিন্দুত্বে বিসর্জ্জন দিয়া আত্মবিস্মৃত হয়, এবং আত্মবিস্মৃত হইয়া, মুসলমানের আনুগত্য স্বীকার করে, আকবর এই অভিপ্রায়েই কৌশলজাল বিস্তার করেন। কোন কোন হিন্দুও সম্রাটের প্রভাবে বিমুগ্ধ হইয়া ঐ জালে আবদ্ধ হয়েন, তাঁহার হস্তে কন্যারত্ন সমর্পণপূর্ব্বক আপনাদিগকে

কৃতার্থ মনে করেন। দাহিরের দুহিতা সুন্দরী না হইলে সিন্ধুজয়ী কাসেমের শিরশ্ছেদ হইত না। হিন্দু আপনার আভিজাত্যের মহিমায় সভ্য সমাজের বরণীয় না হইলে আকবরও বোধ হয়, কৌশলের সহিত বৈবাহিক বন্ধনের সূত্রপাত করিতেন না। কিন্তু আকবর ভবিষ্যদ্দর্শী ছিলেন না। তিনি যদি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কার্য্য করিতেন তাহা হইলে বোধ হয়, হিন্দুকে ঐ উপায়ে আপনার করিয়া লইতে ইচ্ছা করিতেন না। তাঁহার অবলম্বিত নীতি হইতে পরিশেষে অমৃতের বিনিময়ে গরলের উৎপত্তি হয়। তিনি যে কৌশল আপনার অভীষ্টসিদ্ধির পক্ষে অনুকূল বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, সেই কৌশলই শেষে প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়। এই প্রতিকূলভাবের গতিনিরোধ হয় নাই। আকবরের আভিজাত্যভেদসাধিনী নীতি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিশাল সাম্রাজ্যের স্থিতির কারণ না হইয়া, বরং ধ্বংসের একটি কারণস্বরূপ হয়।

যাঁহারা আকবরের সমক্ষে আভিজাত্যরক্ষায় উদ্যত হইয়াছিলেন, মিবারের প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপসিংহ তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। প্রতাপসিংহ আকবরের ন্যায় বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি বা বিপুল সমৃদ্ধির অধিকারী ছিলেন না। আকবরের ন্যায় তাঁহার সৈনিকবল, আকবরের ন্যায় তাঁহার ক্ষমতাগৌরব, আকবরের ন্যায় তাঁহার সার্ব্বজনীন প্রভুত্ব, কিছুই ছিল না। পর্ব্বতময় ক্ষুদ্র জনপদ তাঁহার রাজ্য, বৃক্ষসমাকীর্ণ আরণ্যভূখণ্ড তাঁহার সম্পত্তি, দুর্গম গিরিশঙ্কট তাঁহার অদ্বিতীয় অবলম্বস্বরূপ ছিল। তথাপি প্রতাপসিংহ আকবরের সমক্ষে কেমন গৌরবান্বিত, কেমন মহিমান্বিত কেমন প্রদীপ্ত যশঃপ্রভায় দীপ্তিসম্পন্ন! প্রতাপসিংহের প্রভায় আকবর যেন রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় মলিন

হইয়া গিয়াছেন। ইহার কারণ কি? মণ্ডলেশ্বর মহিমান্বিত সম্রাটের সমক্ষে একজন ক্ষুদ্র রাজপুত ভূপতির এরূপ অসামান্য প্রাধান্যের হেতু কি?

কারণ আর কিছুই নহে। আকবর হিন্দুর যে হিন্দুত্বের গৌরবনাশে উদ্যত হইয়াছিলেন, প্রতাপসিংহ সেই হিন্দুত্বের গৌরবরক্ষায় বদ্ধপরিকর হয়েন। এজন্য তিনি কষ্টকে কষ্ট বলিয়া মনে করেন নাই, হলদিঘাটের শোণিতস্রোতেও ভ্রূক্ষেপ করেন নাই, স্নেহের অদ্বিতীয় অবলম্বন, প্রীতির একমাত্র পুত্তলী, ক্ষুধার্ত্ত তনয়ার কাতরতাতেও বিচলিত হয়েন নাই। যাহা লইয়া হিন্দুর গৌরব, যাহা লইয়া হিন্দুর সম্মান, যাহা লইয়া হিন্দুর মহত্ত্ব, প্রতাপসিংহ হিন্দুর সেই চিরবিশুদ্ধ জাতীয় ভাবের জন্য রণস্থলের বিভীষিকায় দৃক্‌পাত না করিয়া কহিয়াছিলেন, "এই ভাবে দেহ বিসর্জ্জনের নিমিত্তই রাজপুতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে।" প্রতাপসিংহের সাধনা বিফল হয় নাই। যাঁহারা আকবরের পক্ষে ছিলেন, তাঁহারাও এজন্য প্রতাপসিংহের প্রশংসা করিতে বিমুখ হয়েন নাই। হলদিঘাটের যুদ্ধের অবসানে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আকবরের পক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠের পদানত হইয়া কাতরভাবে ক্ষমাভিক্ষা করিয়াছিলেন। মোগল-দরবারের অমাত্যপর্য্যন্ত সুমধুর কবিতায় প্রতাপসিংহের মহৎ কার্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। আর একজন রাজপুত বীর আপনাদের জাতীয়ভাবের অধোগতির উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন :—"আমাদের জাতির বাজারে আকবর একজন দালাল। তিনি সকলকেই কিনিয়াছেন, কেবল উদয়ের তনয়কে কিনিতে পারেন নাই। ... ... বাজারের এই দালাল চিরদিন জীবিত থাকিবে না। একদিন অবশ্যই ইহলোক হইতে অপসৃত

হইবে। তখন আমাদের জাতির সকলেই, পরিত্যক্ত ভূমিতে রাজপুতবীজের রোপণ জন্য প্রতাপের নিকটে উপস্থিত হইবে। যাহাতে ঐ বীজ রক্ষিত হয়, যাহাতে উহার পবিত্রতা পুনর্ব্বার উজ্জ্বল হইতে পারে, তাহার জন্য সকলেই প্রতাপের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।"

মুসলমানের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়াতে রাজপুতদিগের এইরূপ আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল—এইরূপ নিদারুণ অনুশোচনা তুষানলের ন্যায় তাঁহাদের হৃদয়ের প্রতিস্তর বিদগ্ধ করিয়াছিল। তাঁহারা ন্যায় সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হয়েন নাই, আত্মীয়ভাবে মোগলের প্রতিও অনুরাগ প্রকাশ করেন নাই। বরং তাঁহারা জাতীয়ভাবের বিশুদ্ধিরক্ষার জন্য আশ্বস্তহৃদয়ে প্রতাপসিংহের দিকেই চাহিয়া রহিয়াছিলেন। হলদিঘাটের যুদ্ধে প্রতাপসিংহ পরাজিত ও পলায়িত হইলেও জেতার ন্যায় গৌরবযুক্ত। হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষার জন্য তাঁহার সেই পরাক্রম, সেই তেজস্বিতা, সেই কষ্টসহিষ্ণুতা, সর্ব্বোপরি সেই সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন, সমস্তই তদীয় অসামান্য মহত্ত্বের অদ্বিতীয় পরিচয়স্থল। তিনি আত্মবিশুদ্ধির জন্য যেরূপ আত্মসংযমের পরিচয় দিয়াছিলেন, ঐতিহাসিকগণ আহ্লাদ ও প্রীতির সহিত তাহার বর্ণনা করিয়া থাকেন।

বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়াতে যে, সমুদয় হিন্দু সন্তুষ্ট ও মোগলের অনুগত হয়েন নাই তাহা প্রতাপসিংহের বিবরণে বুঝা গেল। এজন্য অসন্তোষ ও ধিক্কারের ভাব তাঁহাদের হৃদয়ে নিহিত ছিল। আওরাঙ্গজেবের সময়ে উহার পূর্ণবিকাশ হয়।

আওরাঙ্গজেব সন্দিগ্ধ ও ধর্ম্মান্ধ ছিলেন। তাঁহার রাজত্বে হিন্দুগণ অনেক বিষয়ে নিপীড়িত হয়েন। এতদিনে মুসলমান

সহচর হিন্দুর মোহনিদ্রা ভঙ্গ হয়। হিন্দু একসময়ে বুদ্ধির দোষে যাঁহার অনুগ্রহলাভের জন্য আভিজাত্যে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, এখন তাঁহার বংশধরের গোঁড়ামিতে এবং অত্যাচার বা অবিচারে তাঁহারা একবারে মর্ম্মাহত হইয়া পড়েন। ধিক্কারের ভাব এখন প্রবল প্রতিহিংসায় পরিণত হয়। যাঁহারা মোগলের কুটুম্ব বা আত্মীয় ছিলেন, তাঁহারাই এখন মোগলসাম্রাজ্যের শত্রু হইয়া উঠেন। পরাক্রান্ত রাঠোরবীর আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। এদিকে মিবারের রাজসিংহ হিন্দুত্বের অবমাননার জন্য সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন। অপরদিকে পরাক্রমশালী শিবাজীর মহামন্ত্রে দক্ষিণাপথের কৃষাণগণ বীরত্বসম্পন্ন হইয়া উঠে। হিন্দুর অধঃপতন, হিন্দুর জাতীয় ভাবের শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া শিবাজী হিন্দুর আভিজাত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য যে মহাশক্তির উদ্বোধন করেন, সেই শক্তিতে মোগল সাম্রাজ্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। আকবর বহুযত্নে ইষ্টকের পর ইষ্টক রাখিয়া যে সুবৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা শেষে তদীয় আভিজত্যভেদসাধিনী নীতির দোষে ধূলিস্তূপে পরিণত হয়।

দেখা গেল, আকবর হিন্দুর সহিত যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে হিন্দুর হৃদয়ে ধিক্কার ভিন্ন সন্তোষের আবির্ভাব হয় নাই। প্রতাপ সিংহ আকবরের সমক্ষে যে দৃষ্টান্ত দেখান সে দৃষ্টান্ত হিন্দু বিস্মৃতিসাগরে ডুবায় নাই। সেই দৃষ্টান্তেই হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষার বাসনা বলবতী হয়, এবং সেই দৃষ্টান্তানুসারেই হিন্দু আভিজাত্য রক্ষার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বিশাল মোগল সাম্রাজ্য বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে। সুতরাং আকবরের প্রবর্ত্তিত কূট রাজনীতি সাম্রাজ্যের স্থিতিসাধনের পরিবর্ত্তে ধ্বংসসাধনেরই সহায়তা করে।

# স্বরলিপি।

## বেদগান।

ঋগ্বেদ, ১০ মণ্ডল ১২১ সূক্ত। প্রজাপতি দেবতা, হিরণ্যগর্ভ ঋষি।

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১
যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্রাজা জগতোবভূব।
য ঈশেঽস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ২
যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ।
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহু কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩
যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবীচ দৃঢ়্হা যেন স্বঃস্তভিতং যেন নাকঃ।
যো অন্তরিক্ষে রজসোবিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৪
যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে।
যত্রাধিসূর উদিতোবিভাতি কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৫
মানোহিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যোবা দিবং সত্যধর্ম্মা জজান।
যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতীর্জজান কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৬

আত্মদা বলদা যিনি; সর্ব্ব বিশ্ব সকল দেবতা
বহিছে শাসন যাঁর; মৃত্যু ও অমৃত যাঁর ছায়া;
সেই কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি?
যিনি স্বীয় মহিমায় বিরাজেন একমাত্র রাজা
প্রাণবান্ জগতের, চতুষ্পদ দ্বিপদ প্রাণীর;
সেই কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি?
এই হিমবন্ত গিরি, নদীসহ এই অম্বুনিধি
বিশাল মহিমা যাঁর; এই সর্ব্ব দিক্ যাঁর বাহু
সেই কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি?
যাঁর দ্বারা দীপ্ত এই দ্যুলোক, পৃথিবী দৃঢ়তর;
যিনি স্থাপিলেন স্বর্গ, অন্তরীক্ষে রচিলেন মেঘ;

সেই কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি ?
মহাশক্তি-প্রতিষ্ঠিত দীপ্যমান দ্যুলোক ভূলোক
যাঁরে করে নিরীক্ষণ ; সূর্য্য যাঁহে লভিছে প্রকাশ ;
সেই কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি ?
যিনি সত্যধর্ম্মা, যিনি স্বর্গ পৃথিবীর জনয়িতা
আমাদের না করুন্ নাশ। স্রষ্টা যিনি মহাসমুদ্রের ;
সেই কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি ?

৩।২

। সা সা -া। -া -া ঋা। গা -া -া। -া গা গা।
। য আ —। — — ত্ম। দা — —। — ব ল।

। ঋা -া -া। -া -া -া। মা -া মা। মা -া মা।
। দা — —। — — —। য — স্য। বি — শ্ব।

। মা মা -া। গমা পা মা। গা -া -া। -া -া -া।
। উ পা —। — — স। তে — —। — — —।

। গা পা পা। -া -া -া। পা -া পক্ষা। পা -া -া।
। প্র শি ষং। — — —। য — স্য। দে — —।

। না ধা -া। -া -া -া। সা -া সা। সা -া -া।
। বাঃ — —। — — —। য — স্য। ছা — —।

। ন্া -া সা। ঋা -া -া। -া -া -া। সা -া ন্া।
। য়া — মৃ। তং — —। — — —। য — স্য।

। ধ্া -া ন্া। -া -া -া। গা -া -া। পা -া ক্ষা।
। মৃ — ত্যুঃ। — — —। ক — —। স্মৈ — —।

। ধা -া পা। র্সা -া -া । -া -া র্সা। র্সা র্সা র্সা।
। দে — —। বা — —। — — য়। হ বি ষা।

। -া -া র্সা। র্সা -া নর্সা। র্ ঁ -া -া । র্সা -া -া ।
। — — বি। ধে — — । — — —। ম — —।

। -া -া -া।
। — — — ।

। গা -া গা। -া -া মা। পা -া -া। -া -া -া ।
। যঃ — প্রা। — — ণ। তো— —। — — —।

। ধা পা মা। পা -া -া । গা গা -া। মা -া ধা।
। নি মি ষ। তো — — । ম হি —। ত্বৈ — ক।

। পা -া রা। -া গা -া । -া -া মা। ধা পা -া ।
। ই — ন্দ্রা। — জা —। — — জ। গ তো —।

। রা রা রা। গা গা -া । -া -া -া । গা গা -া ।
। — ব ভূ। — ব —। — — —। ব ঈ —।

। গা -া রা। -া -া সা। সা সা -া । সা সা -া ।
। শে — ষ্য। — — দ্বি। প দ —। শ্চ তু —

। সা সা -া । -া -া -া । গা -া -া । পা -া স্কা ।
। ষ্প দঃ —। — — —। ক — —। স্মৈ — —

ইত্যাদি।
ইত্যাদি।

। সা -া সা। -া সা -া। ধা -া ধা। ধা ধা -া ।
। য — স্যো। — মে —। — — হি। ম ব —

। ধা পা র্সা। -া -া র্সা। র্সা -া র্সা। -া না র্রা।
। স্তো — —। — — ম। হি — ত্বা। — — —।

। র্সা -া -া। -া -া -া। র্সা -া র্রা। র্রা র্রা -া।
। — — —। — — —। য — স্য। স মু —।

। র্গা -া -া। র্রা র্রা র্রা। -া র্সা র্সা। র্সা -া না।
। দ্রং — —। র স য়া। — — স। হা — হুঃ।

। -া -া -া। পা -া পা। -া ক্ষপা ধনা। -া -া -া।
। — — —। য — স্যে। — মাঃ —। — — —।

। পা না ধা। -া -া -া। পা -া পা। পা র্সা -া।
। প্র দি শো। — — —। য — স্য। বা — —।

। না -া -া। -া -া -া। গা -া -া। পা -া ক্ষা।
। হূ — —। — — —। ক — —। স্মৈ — —।

ইত্যাদি।
ইত্যাদি।

। গা -া গা। -া গা -া। গা -া গা। -া -া -া।
। যে — ন। — দ্যৌ —। রু — গ্রা। — — —।

। গা মা মা। -া -া পা। পা -া পা। -া -া -া।
। পৃ থি বী। — — চ। দৃ চ হা। — — —।

। মা -া মা। -া মা -া। মা মা মা। -া -া -া।
। যে — ন। — স্বঃ স্। ত ভি তং। — — —।

। মা গা মা। পা -া মা। গা -া -া। -া -া -া।
। যে — ন। না — কঃ। — — —। — — —।

। গা -া গা । -া -া গা । গা -া গা । -া -া -া ।
। বো — অ । — — স্ত । রি — ক্ষে । — — — ।

। রা রা রা । -া সা সা । সা -া সা । -া -া -া ।
। র জ গো । — — বি । মা — নঃ । — — — ।

। গা -া -া । পা -া ক্ষা । ইত্যাদি ।
। ক — — । টৈশ্ব — — । ইত্যাদি ।

। গা -া -া । পা -া ধা । র্সা -া র্সা । র্সা র্সা -া ।
। যং — — । ক্র — ন্দ । সী — অ । ব সা — ।

। র্সা -া র্সা । র্সা না র্রা । র্সা -া -া । -া -া -া ।
। ত — স্ত । ভা — — । নে — — । — — — ।

। র্সা -া র্রা । -া র্রা -া । র্রা -া র্রা । র্রা র্রা -া ।
। আ — দৈত্য । — ক্ষে — । তাং — ম । ন সা — ।

। র্রা -া র্রা । র্সর্রা র্সরা র্গা । র্গা -া -া । -া -া -া ।
। রে — জ । মা — — । নে — — । — — — ।

। র্গা -া -া । র্গা -া র্গা । র্গা -া -া । -া -া র্গা ।
। ব — — । ত্রা — ধি । শৃ — — । — — র ।

। র্গা র্মা র্গা । -া র্রা র্রা । র্রা -া র্সা । -া -া -া ।
। উ দি তো । — — বি । ভা — তি । — — — ।

। গা -া -া । পা -া ক্ষা । ইত্যাদি ।
। ক — — । টৈশ্ব — — । ইত্যাদি ।

। পা -া -া । জ্ঞা -া পা। ধা -া পা। -া -া মা।
। মা — —। নো— —। হিং— সী। — — জ্ঞ।

মা মা -া । মা -া গা। গা -া গা। -া -া -া ।
। নি তা — । যঃ — পৃ । থি — ব্যা। — — —।

গা -া মা। পা র্সা -া । নধা না ধা। পা -া মা।
। মা — —। নো — —। হিং — —। সী — জ্ঞ।

। মা মা -া । মা -া গা। গা -া গা। -া -া -া ।
। নি তা —। যঃ — পৃ। থি — ব্যা। — — —।

। গা -া -া । ঋা -া গা। মা -া -া । গা -া পা।
। ঘো— —। বা — দি। বং — — । স — ত্য।

। মা -া মা। -া -া ধা। পা -া পা। -া -া -া ।
। ধ — র্ম্মা। — — জ। জা — ন। — — —।

। সা -া -া । সা -া সা। গা -া গা। -া -া -া ।
। য — —। শ্চা — প। শ্চ — র্য্যা। — — —।

। সা সা সা। -া -া গা। গা -া গা। -া -া -া ।
। বৃ হ তী। — — র্জ। জা — ন। — — —।

। গা -া -া । পা -া জ্ঞা। ধা -া পা। র্সা -া -া ।
। ক — —। ত্রৈ — —। দে — — । বা — —।

। -া -া র্সা। র্সা র্সা র্সা। -া -া র্সা। নর্সা ঋা র্সা।
। — — য়। হ বি ষা। — — বি। ধে — ন।

। -া -া -া । র্সা -া র্সর্রা। র্গা -া -া। র্রর্গা র্রা -া।
। — — —। ক — ষ্মৈ। — দে —। দে — —।

। র্সর্রা র্সা -া। -া -া না। ধা ধা পধা। -া -া পা।
। বা — —। — — য়। হ বি ষা। — — বি।

। ক্ষপা -া গা। -া -া -া। গা -া -া। গা -া -া।
। ধে — ম। — — —। ক — —। ষ্মৈ — —।

। গা -া -া। রগা -া -া। -া -া রা। রা রা রা।
। দে — —। বা — —। — — য়। হ বি ষা।

। -া সা সা। সা -া -া। সা -া -া॥
। — — বি। ধে — —। ম — —॥

"কষ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম" এই কথাগুলি এই গানের ধুয়া। প্রতি শ্লোকের পর ইহা একই সুরে গীত বলিয়া আমরা কেবল প্রথমবার ইহার স্বরলিপি দিয়াছি এবং শেষে আর দুইবার ভিন্ন সুরে গীত হয় বলিয়া তাহারই স্বরলিপি দেওয়া হইল। সচরাচর গানের ন্যায় আস্থায়ীতে ফিরিয়া যাইতে হইবে না। পর পর শেষ পর্য্যন্ত একটানে গাহিতে হইবে।

---

# হিন্দু দেবদেবীর চিত্র।

দেবতাপ্রিয় ভারতবর্ষীয় কল্পনা বহিঃপ্রকৃতি ও মানবচরিত্রে যেখানে যে সৌন্দর্য্যটুকু অনুভব করিয়াছে তাহাকে একটি নির্দ্দিষ্ট গঠন দিয়া নিঃশব্দে আপন দেবতা গড়িয়া তুলিয়াছে। সেইজন্য ভারতবর্ষের পৌরাণিক দেবভূমিতে আসিয়া হৃদয় যেমন পরিতৃপ্ত

হয় এমন আর কিছুতে নহে। গ্রীসীয় প্রস্তরমূর্ত্তির অতুলনীয় দেহসৌন্দর্য্য হয় ত আমাদের দেবলোকে সর্ব্বত্র তেমন সুলভ নহে, কিন্তু এই সকল দেবমূর্ত্তিতে আমাদের অন্তরের বহু গভীর আকাঙ্ক্ষা মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছে এবং ভারতবর্ষের অনাবিল অন্তরতম অন্তর সুন্দর অভিব্যক্ত হইয়াছে।

আমাদের সুখ দুঃখ, বেদনা আশা, সৌন্দর্য্য প্রেম, মোহ আকাঙ্ক্ষা সকলই এই দেবলোকে। যাহা কিছু মর্ত্ত্য—নিতান্তই ঐহিক—তাহাও আমরা মর্ত্ত্যলোকে সাহস করিয়া রাখিতে পারি নাই; দেবতাকে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি। তাই যোগী শিবকে পার্ব্বতীর সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া এই মর্ত্ত্য গার্হস্থ্যকে কৈলাসের অমরলোকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। কন্দর্পকে কেবলমাত্র সামান্য নরনারীর হৃদয়বন্ধন না করিয়া হরপার্ব্বতীর চিরবন্ধনরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। যমুনাতীরের তমালছায়া-সুপ্ত সুন্দর আহীরপল্লীটিকে মানবের না রাখিয়া দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখানে যুদ্ধ বিগ্রহ, দ্বন্দ্ব কোলাহল, মান অভিমান, প্রণয় বিরহ যেমন যাহা ঘটে, দেবলোকে সকলই বজায় আছে; কেবল, এখানে মৃত্যু আছে, সেখানে মৃত্যু নাই। মৃত্যুও সেখানে অমর।

কিন্তু এই মৃত্যুই মর্ত্ত্যের প্রধান সৌন্দর্য্য—পৃথিবীর সকল সুখদুঃখ বেদনা আনন্দের চরম পরিণাম। এই যে সকলি আছে অথচ সর্ব্বদাই হারাইবার ভয়, এই যে নশ্বরতা, ইহাতেই ইহলোকের সকল সুখদুঃখ নিহিত। দেবলোকে যদি এই মৃত্যুই না রহিল, তবে দেবতাদের সুখদুঃখের সহিত আমাদের সুখদুঃখের সম্বন্ধ কিসের? ভারতবর্ষীয় হৃদয় সুতরাং অমরধামেও মৃত্যুর ছায়া রচনা না করিয়া থাকিতে পারিল না। সতীর দেহত্যাগে

ও রতিপতির অনঙ্গীকরণে এই মৃত্যুরই অনুরূপ চিত্র সূচিত হইয়াছে।

এইরূপে সমস্ত মর্ত্ত্য গুণাবলী দেবতায় আরোপিত হইয়া দেব-লোকেই আমাদের অন্তর বিকাশ লাভ করিয়াছে। মানবের অতি তুচ্ছ সুখদুঃখ পর্য্যন্ত দেবতার। এবং বৃহৎ দেবলোক এই মর্ত্ত্যধামেরই একখানি সুন্দর চিত্র। এই গঙ্গাই সেখানে মন্দা-কিনীরূপে চিরপ্রবাহিত; এবং এখানকার মলয়ানিলস্নিগ্ধ চূত-মুকুলিত বসন্ত মন্মথের সখারূপে নিত্য বিকশিত। অপ্সরাগণ সেখানে জলক্রীড়া করে এবং চারু-অঙ্গনদ্ধ যৌবন চতুর্দ্দিকে চিত্ত উদ্ভ্রান্ত করিয়া তোলে। মানবহৃদয় স্পর্শ করে না দেবরাজ্যে এমন কিছুই নাই।

সেই জন্যই ভারতবর্ষের সাধারণ্যে দেবদেবীর চিত্র যেরূপ সমাদৃত এমন আর কিছুই নহে। এবং চিত্রের দ্বারা আমাদের অন্তর স্পর্শ করিতে হইলে এই সকল চিত্রই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। শিব দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী, কৃষ্ণের বাল্য যৌবন বিবিধ লীলা, দেব-লোকের নানাবিধ কাহিনী আমাদের সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ে বহু যুগ ধরিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এবং মনে মনে আমরা এই সকল দৈব সৌন্দর্য্যের একটি অসম্পূর্ণ চিত্র গড়িয়া রাখিয়াছি। চিত্রকরের শিল্পনৈপুণ্যে এই অসম্পূর্ণ অপরিস্ফুট ভাব সৌন্দর্য্যে ও জীবনে পূর্ণ হইয়া উঠে।

দুঃখের বিষয়, বঙ্গদেশে ধর্ম্মচিত্রাবলী এ পর্য্যন্ত যাহা বাহির হইয়াছে তাহাতে হৃদয়ে সৌন্দর্য্য উন্মেষিত ত হয়ই না, বরঞ্চ অনেক সময় প্রাচীন সংস্কৃত আদর্শের সৌন্দর্য্যটুকু ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে। দেবতার প্রাচীন আদর্শ আমাদের মনেও যে সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ আছে তাহা নহে। সেনাপতি কার্ত্তিকেয় বঙ্গনারীর

সন্তানকামনায় দেবতা হইয়া অবধি ধীরে ধীরে বর্ম্ম ছাড়িয়া ধুতি চাদর ধরিয়াছেন এবং ময়ূরে চড়িয়া যখন বাহির হন তখন হিন্দুস্থানী কাঠিন্য সে দেহে কিছুমাত্র প্রকাশ পায় না। বাঙ্গলার চিত্রকর যদি এই অধুনাতন বঙ্গীয় ভাবে কিঞ্চিৎ অধিকমাত্রায় বিচলিত হয়েন সে জন্য তাঁহাকে তত দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু কার্ত্তিকেয়কে বাঙ্গালী করিয়া আঁকিলেও তাঁহার গঠন ও মুখশ্রীতে সৌন্দর্য্যের বিশেষ বিকাশ হওয়া আবশ্যক। কারণ, সংস্কৃত আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইলেও আমাদের মনে কার্ত্তিকেয়ের রূপের প্রতিষ্ঠা অটল।

কিন্তু বাঙ্গলার চিত্রশিল্পে রূপ যে কোথায় প্রচ্ছন্ন থাকে তাহা দেবতারাও জানেন না। সৌন্দর্য্য উন্মেষিত করিতে পারিলে স্থলবিশেষে প্রচলিত আদর্শের অনুসরণ করিয়াও চিত্রকর আপন গৌরব রক্ষা করিতে পারিতেন। তাহাতেও ত বিশেষ একটা ভাবের বিকাশ থাকিত। এবং সেই ভাবের গুণে সংস্কৃত আদর্শ হইতে অল্পবিস্তর বিচ্যুতি কাহারও নিকট তেমন মারাত্মক বলিয়া বোধ হইত না। চিত্রকর যে ভাবেই চিত্রিত করুন, ভাবটি চিত্রে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে হইবে; এবং চিত্র যেন কোথাও অসঙ্গত না হয়।

কিন্তু সঙ্গতি বঙ্গীয় চিত্রাবলীতে কদাচ লক্ষিত হয়। মানব-দেহের বর্ণ মানুষের মত না হওয়া, গঠনে প্রকৃতির সাধারণ নিয়-মের ব্যতিক্রম, এবং মুখশ্রীতে সকল ভাবের আত্যন্তিক অভাব— ইহাই এখন আমাদের চিত্রশালার গৌরব। গৌরাঙ্গ পীতবর্ণ; কারণ, কাব্যে গৌর অঙ্গের সহিত তপ্তকাঞ্চনের সাদৃশ্য উল্লিখিত হইয়াছে এবং তপ্তকাঞ্চনে হরিদ্রার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। রাধার প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণ যেন যুগ যুগ ধরিয়া সর্ব্বাঙ্গে প্রাণপঙ্কে

নীল পেন্সিল ঘষিয়াছেন; এবং এই বহু পেন্সিলঘর্ষণের ফলে কেবলমাত্র শ্রীমতী রাধিকার হৃদয় নহে কিন্তু বাঙ্গলার রাধিকা-গঞ্জন ধর্ম্মচিত্রকরদিগেরও হৃদয় মন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। রণোন্মাদিনী শ্যামা এই অঙ্গারধূমোদ্গারী কলিযুগে মূর্ত্তিমতী রাণীগঞ্জগঞ্জিনী—অবিশ্রাম আলকাতরা লেপন ভিন্ন সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতাও মানবশরীরে সে বর্ণের আভাস ব্যক্ত করিতে অক্ষম।

কিন্তু এই অদ্ভুত বর্ণসঙ্গম চিত্রকরের দোষে ঘটিয়াছে অথবা সংস্কৃত আদর্শের দোষে? সংস্কৃত সাহিত্যে শ্যামা রাত্রির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা; এবং কৃষ্ণেরও বর্ণ মেঘের ন্যায়। সুতরাং মানবদেহে এই রাত্রি অথবা মেঘের বর্ণ ফুটাইতে হইলে চিত্রকর রাণীগঞ্জ নীল পেন্সিল প্রভৃতির শরণাপন্ন না হইয়া কি করেন? কিন্তু, সাহিত্যরসজ্ঞ মাত্রেই জানেন, উপমা সাদৃশ্যসূচক মাত্র। চন্দ্রবদন বলিলে কাহারও মনে একটি কলঙ্করেখালাঞ্ছিত দীপ্ত গোলাকার মুখমণ্ডল উদিত হয় না—মনে একটি প্রস্ফুটিত সৌন্দর্য্যের ভাব উদ্রেক করে মাত্র। শ্যামার বর্ণ কালরাত্রির ন্যায় বলিলে সত্য-সত্যই শ্যামা যে রাণীগঞ্জসম্ভবা এমন বুঝায় না—কেবল একটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ভীষণগম্ভীর সৌন্দর্য্যের আভাস দেওয়া হয়। কৃষ্ণেরও বর্ণ সেইরূপ বাস্তবিকই মেঘ নহে। এবং নবদূর্ব্বাদল-শ্যাম রামচন্দ্রের বর্ণও নবোদ্গত দূর্ব্বাহরিৎ নহে—নবদূর্ব্বার স্নিগ্ধশ্যাম লাবণ্যবিশিষ্ট বটে। মানবের বর্ণ কখনও মেঘ অথবা রাত্রি অথবা দূর্ব্বার মত হয়?

বর্ণও বস্তুভেদে বিভিন্ন। আকাশের নীলবর্ণ সমুদ্রের নীল নহে এবং নীলকণ্ঠের কণ্ঠ এতদুভয় হইতেই স্বতন্ত্র। শ্বেতকায় মানব শ্বেতকায় গোবৎসের সহিত একবর্ণ নহে; এবং দুগ্ধ, তুষার, ধবল বস্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় শ্বেত পদার্থ মানবের শ্বেতবর্ণের চিত্র নহে। আমাদের দেশের গৌরবর্ণে হরিদ্রার ঈষৎ আভাস পাওয়া যায়, তাই বলিয়া তাহা হরিদ্রারঞ্জিতবৎ নহে। শ্যামবর্ণও সেইরূপ যতই শ্যাম হউক্ না কেন, মসীর মতও নয়, অঙ্গারসদৃশও বলা যায় না। সাহিত্যে এরূপ সাদৃশ্যগত অতিশয়োক্তি তাদৃশ দোষের নহে, কারণ, সাহিত্য পাঠকের মনে এই সকল সাদৃশ্যের দ্বারা বস্তুর যথার্থ চিত্রগ্রহণে

বিঘ্ন উৎপাদন করে না। কিন্তু চিত্রে এ সকল আতিশয্য সর্ব্বথা পরিহর্ত্তব্য—চিত্র বস্তুকেই যথাযথ চিত্রিত করে।

ইহাও কে না জানে যে, নীল অথবা হরিদ্বর্ণ মানব আমাদের কাহারও মনে কোনরূপ সৌন্দর্য্য উদ্রেক করিতে পারে না? কৃষ্ণ যদি আকাশের মত নীল হইতেন তাহা হইলে কি সমস্ত গোপীকুল তাঁহার জন্য কুলমানে জলাঞ্জলি দিতে বসিত? না, গৌরাঙ্গী রাধিকা অহর্নিশি গুরুজন ও ননন্দার বাক্যবাণ সহ্য করিয়াও ঐ শ্রীপাদপদ্মে সমস্ত শরীর মন আত্মা সমর্পণ করিতেন? নীল মানববর্ণের কোনও আকর্ষণ নাই। কৃষ্ণবর্ণে একটি সুকুমার উজ্জ্বল লাবণ্য দেখা যায়, তাহাতে একটি প্রশান্ত কমনীয়তা আছে। সেই জন্যই মহাভারতকার সাহস করিয়া কৃষ্ণা দ্রৌপদীকে স্বয়ম্বরসভায় উপস্থিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকে কবি নারীসৌন্দর্য্যের মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াও অম্লান রাখিয়াছেন।

কিন্তু এ সকল ত গেল প্রেমসিক্ত সৌন্দর্য্যের কথা। যখন করালকালিকার ভীষণ ভাব ব্যক্ত করিতে হইবে তখন একটু অস্বাভাবিক কালো না করিলে চলিবে কেন? সে উলঙ্গিনী উন্মাদিনী মূর্ত্তি দু'এক পোঁছ আলকাতরা নহিলে ত খুলে না। কিন্তু কালীর ভীষণতা ব্যক্ত করিতে হইলে এই অমানুষিক মিথ্যাবর্ণের আশ্রয় লইতে হইবে এ কথা নূতন। ভীষণতা তাঁহার কিসে ব্যক্ত হয় নাই? নারীহৃদয় কঠিন হইয়া গিয়া শুধু শোণিতলালসায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে এ দৃশ্য ভীষণ নহে? যে বক্ষে সন্তান স্নেহ পান করিয়া পরিপুষ্ট হইত, সে বক্ষ জুড়িয়া সহস্র নৃমুণ্ড হইতে তপ্ত রক্ত ঝরিতেছে—ইহাতে কি ভীষণতার অভাব আছে? সে কৃপাণহস্তা উলঙ্গিনী মূর্ত্তিই কি যথেষ্ট ভীষণ নহে? যে চিত্রকর শ্যামার দৈহিক গঠনে সৌন্দর্য্য ক্ষুণ্ণ করিয়া, জিহ্বাকে হস্তাধিক বিস্তৃত করিয়া দিয়া এবং সর্ব্বাঙ্গে অদ্ভুত রং লেপন করিয়া তাঁহার ভীষণতা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করেন, সে চিত্রকরের প্রতিভার প্রশংসা করা যায় না।—সাহিত্যের যথার্থ মর্ম্মগ্রহণ করিতে না পারিয়া এবং নিরক্ষর কুম্ভকারগণের পদানুসরণ করিয়া আমাদের চিত্রকরেরা এই ত্রুটিগুলি ঘটাইয়াছেন।

চিত্রকরের প্রথম কর্ত্তব্যই এই যে, এই সকল দেবদেবীসৃষ্টির মূলে যে সৌন্দর্য্যকল্পনা নিহিত আছে সেইটিকে আয়ত্ত করা। নহিলে, অসংখ্য সরল এবং বক্র রেখাপরম্পরার সমাবেশেও চিত্র কখনও উজ্জ্বল হইয়া উঠে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের চিত্রকরদিগের হস্তে মহাদেবের যে সকল দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

মহাদেব আমাদের পুরুষসৌন্দর্য্যের চরম আদর্শ। কেবলি দৈহিক গঠনে নহে, অন্তরের ভাবে ও বাহিরের চালচলনেও তিনি পরম পুরুষ। একদিকে বৈরাগ্য, অন্যদিকে গার্হস্থ্য; এবং সেই অবিচলিত চরিত্রে উভয়েরই সমান প্রতিষ্ঠা। তাঁহার গৃহিণী অন্নপূর্ণা; অনুচর নন্দী ভৃঙ্গী; তিনি স্বয়ং ভোলানাথ শিব সদানন্দ। নিজের জন্য তাঁহার কিছুই নাই। সর্ব্বস্ব অন্নপূর্ণার হস্তে সমর্পণ করিয়া দিয়া শিব ভিখারী।

এই যোগী-গৃহস্থ আমাদের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। গৃহে গৃহে শুভ্রবসনা কুমারীরা এই আদর্শের অনুরূপ পতিকামনায় নিত্য শিবপূজা করে। ঐ রূপ, ঐ অনিন্দিত উদার স্বভাব, ঐ অতুল প্রতাপ এবং ক্ষমাশীল ধৈর্য্য নারীহৃদয়ের সমস্ত পূর্ণ করিয়া আছে।

কিন্তু চিত্রপটে পেশীবিহীন গঠন, বাবু-মুখশ্রী, তাম্বূলরাগরক্ত অধর এবং নিষ্প্রভ ভাব মন্থন করিয়া এ শিবত্বের কিছুই পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ ভাব সম্বন্ধে আমাদের চিত্রকরেরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। নহিলে, মদনভস্মের চিত্রে চিত্রকর মহাদেবের ললাটদেশ হইতে একটি তাম্রলোহিত ঝাঁটা বাহির করিয়া দিবেন কেন? যে দীপ্ত রোষানলে মদন ভস্ম হইয়াছিল ইহাতে তাহা প্রকাশ পায় নাই; প্রকাশ পাইয়াছে কেবল উক্ত স্থূলকায় ঝাঁটা—যাহার অগ্রভাগে অগ্নি সংযুক্ত হইয়া মদনকে দগ্ধ করিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

শুধু শিব নহে, দেবতাদের অনেকেই এইরূপ চিত্রকরের হস্তে পড়িয়া বহুবিধ বিকৃতি লাভ করিয়াছেন। দেবীগুলির উল্লেখ না করাই ভাল—আমাদের চিত্রশালায় এমন একখানি চিত্র নাই যাহা দেখিয়া দেবীকে দেবকুলোদ্ভবা বলিয়া মনে হয়। বোধ করি, চিত্রকরেরা যদি কিছুকাল স্ব স্ব মানসী সৌন্দর্য্যকে মনান্ত-

রিত করিয়া দিয়া মানবী মডেল দেখিয়া চিত্র আঁকিতে সুরু করেন, তাহা হইলেও দেবতারা ইহলোকে কতকটা প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারেন।

এবং সেই সঙ্গে দেশের সর্ব্বসাধারণেরও কিছু উপকার হয়। দেবতায় ভক্তি স্থাপন করিতে গিয়া পৃথিবীর যাবতীয় কুৎসিৎ বিকৃতিতে হৃদয় প্রতিষ্ঠিত হয় না। অন্তরে সৌন্দর্য্যের একটি অক্ষুণ্ণ আদর্শ জাগ্রত হইয়া উঠে। এবং এই সৌন্দর্য্যজ্ঞান সংসারের ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় অনুষ্ঠানে প্রযুক্ত হইয়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সুন্দরতর করিয়া তোলে।

চিত্রকরের হস্তে এই এক মহা সংস্কার নির্ভর করিতেছে। সাহিত্যকারের দায়িত্ব অপেক্ষা তাঁহার দায়িত্ব কম নহে। সাহিত্য বরঞ্চ অনেকের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে সময় লাগে। চিত্র আপন নির্দ্দিষ্ট গঠনপ্রভাবে সহজেই অন্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেই জন্যই বিশেষতঃ চিত্রকরেরা যখন সাহিত্যের সুন্দর আদর্শকে নষ্ট করিতে বসেন তখন তাঁহারা দেশের যে কতদূর ক্ষতি করেন তাহা বলা যায় না। একটি রাজনৈতিক অধিকার লাভ অপেক্ষা জাতির হৃদয়ে একটি সুন্দর আদর্শের প্রতিষ্ঠা করা গুরুতর কার্য্য। এই গুরুতর দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়া আমাদের প্রাচীন সৌন্দর্য্য-সমূহকে যে চিত্রকর অক্ষুণ্ণ বিকশিত করিয়া তুলিতে পারেন, তিনি দেশের একজন মহাত্মা।

# সাধনা।

## অতিপ্রাকৃত।

দুই চারি জন খ্যাতনামা ব্যক্তি অতিপ্রাকৃত ঘটনায় বিশ্বাস করেন দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে সাধারণের মনে একটা বিষম খট্‌কা উপস্থিত হয়। অমুক অমুক ঘটনা এতদূর অবিশ্বাস্য যে, মনকে নিতান্ত বলপূর্ব্বক না টানিলে মন সেদিকে যায় না; তথাপি আমাদের অপেক্ষা নানাবিষয়ে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যখন সেই সেই ঘটনায় নির্ব্বিবাদে বিশ্বাস করিতেছেন, তখন কতকটা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতে হয়।

শ্রীমতী বেসাণ্ট কিছু পূর্ব্বে নাস্তিক ছিলেন। অবশ্য সাধারণ নাস্তিকের মত তিনিও খৃষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত অতিপ্রাকৃত ঘটনা মানিতেন না। সম্প্রতি তিনি পূর্ব্ব মত ত্যাগ করিয়া থিয়সফিষ্ট হইয়াছেন। অতিপ্রাকৃত লইয়াই প্রধানতঃ থিয়সফির কারবার। এতবড় বুদ্ধিমতী রমণী, যাঁহার তর্কশক্তির নিকট বড় বড় ধর্ম্মব্যবসায়ীকে অবনতমস্তক হইতে হইত, তিনি সহসা এরূপ মানসিক বিপ্লবগ্রস্ত হইয়া উঠিলেন কিরূপে ঠিক্ বুঝা যায় না। অ্যানি বেসাণ্টের এই অচিন্তিতপূর্ব্ব মতবিপ্লবে থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায় ঘোর রবে জয়ঢক্কা নিনাদ করেন। তাঁহাদের মুখে আরও দুই একটা বড় বড় নাম শুনা যায়। অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসের কথা উঠিলেই তাঁহারা উল্লাসের সহিত

ক্রুক্স্, ওয়ালাস্ প্রভৃতির নাম করিয়া বসেন। বলা বাহুল্য, এই দুইটা নাম বৈজ্ঞানিকদের সমাজে বড়ই উচ্চস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সুতরাং এই নাম উচ্চারিত হইবামাত্র অনেককে কতকটা স্তম্ভিত, কতকটা নীরব হইতে হয়।

কথাটা এই,—মনুষ্যচরিত্র ভাল বুঝা যায় না। আনি বেসা-ন্টের জীবনকাহিনী আগাগোড়া আলোচনা করিলে তাঁহার মতির স্থিরতায় ও গাম্ভীর্য্যে কতকটা সংশয় জন্মিতে পারে, এবং ইংরাজ জাতির স্বাভাবিক পরমায়ুর প্রতি একটু কটাক্ষ রাখিলে, শ্রীমতীর জীবনের শেষ অধ্যায় ঠিক্ আরম্ভ হইয়াছে কি না সে বিষয়েও স্থির কথা বলিতে ইতস্ততঃ করিতে হয়। যাহা হউক্ অন্যান্য ব্যক্তির সম্বন্ধে সে তর্ক বড় চলে না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, মনুষ্যচরিত্র রহস্যময়। অতিমাত্র সংযতচিত্ত মনস্বী ব্যক্তিরও মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে কোন স্তরে, কোন পরদার অন্তরালে, এমন একটা গোলযোগ-জনক কিছু থাকিতে পারে, যাহাতে তাঁহার বাহ্য আচরণ ও কার্য্যপ্রণালীর সামঞ্জস্য অকস্মাৎ নষ্ট করিয়া দেয়। এতটুকু নির্ভয়ে বলিতে পারা যায়। বলিলেও তাহার উত্তর নাই। তথাপি অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস মানবজাতির মধ্যে এতটা প্রচলিত, যে, এই বিশ্বাসের মূল ও অর্থ সম্বন্ধে একটু আলোচনা নিরর্থক না হইতে পারে।

অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসটা প্রায় সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্রই ন্যূনাধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই বিশ্বাস মনুষ্য-জাতির ঠিক্ প্রকৃতিগত এবং স্বভাবসিদ্ধ কি না এই বিষয়ে প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে। নিজের মনের কথা সাহসের সহিত ও স্পষ্ট করিয়া বলিলে বলিতে হয়, যেন অতি প্রাকৃতে

বিশ্বাসের দিকে মনের একটা ঝোঁক্ আছে, যেন ঐ বিশ্বাসে মন একটু আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ করে। ভূত মানি বলিতে সকলের নৈতিক সাহসে কুলায় না; তবে মনের পরদায় স্তরের নীচের স্তর খুঁজিয়া দেখিলে, সেখানে যেন ভূতের অস্তিত্বের প্রতি একটা তীক্ষ্ণ সহানুভূতি দেখা যায়। সময়ে অসময়ে, বিজনে আঁধারে সহানুভূতিটা মৌখিক অবিশ্বাস ও যুক্তির আচ্ছাদন ছিন্ন করিয়া হৃৎকম্পন প্রভৃতি দৈহিক ইঙ্গিতে আপনাকে প্রকট করিয়া ফেলে। মুখ যখন বলে, ভূত আবার কি, মন যেন ভিতরে থাকিয়া ইসারায় হাস্য করে। অনেকের মানসিক অবস্থাটা এরূপ, লজিকে ও স্বভাবে গণ্ডগোল উপস্থিত করিয়া মনের ভিতর এরকম একটা উড়ু-উড়ু ভাব সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে, যে, যদি কোন প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক আসিয়া হঠাৎ প্রতিপন্ন করিয়া দেন, যে, ভূত আছে, ও তাহার রঙ্ কালো ও পা বাঁকা, তাহা হইলে মনটা যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। যাহা হউক্ এই সকল দেখিয়া বোধ হয় যেন অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। মনুষ্যজাতির ইতিহাস অধ্যয়ন করিলেও এই সংস্কারই বদ্ধমূল হয়। আদিকালে মনুষ্যমাত্রই অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস করিত; এবং এক্ষণে যে মনুষ্যসম্প্রদায় জ্ঞানজীবনের শৈশবভাব ত্যাগ করে নাই, তাহারাও নির্ব্বিঘ্নে ও নিরুদ্বেগে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস করিয়া থাকে। কেবল যে তাহারাই করে, এরূপ বলিলে বড়ই পক্ষপাতিতা ও অবিচার করা হয়। কেন না, যাঁহারা জ্ঞানজীবনে যৌবনগ্রস্ত বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারাও এই বিশ্বাসের হাত হইতে একেবারে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন বোধ হয় না। কেন না, অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসের উপর অদ্যাপি বড় বড় ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠিত

রহিয়াছে। এই পর্য্যন্ত বলিতেছি, যে, জ্ঞানের উন্নতি ও বিস্তারের সহিত অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসটা কমিয়া আসে। আজকাল অনেক লোক এমন আছে, যাহারা এই বিশ্বাস অঙ্গীকার করিতে লজ্জিত হয়, দুই একজন বা প্রকৃতই বিশ্বাস করে না। সুতরাং মোটের উপর দাঁড়ায় এই, যে, অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ; অবিশ্বাস মানুষের উপার্জ্জিত।

একটু চাপিয়া ধরিলে এই সিদ্ধান্তটা কতদূর টিঁকে বলা যায় না। একটু যেন যুক্তিতে গোলযোগ আছে। কিন্তু গোলযোগ ঠিক্ অর্থগত বা ভাবগত নহে, অনেকটা শব্দগত বা আভিধানিক। প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত এই শব্দ দুইটার অর্থ লইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে। প্রাকৃত শব্দের অর্থ যাহা প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট, প্রাকৃতিক নিয়মসঙ্গত ; অতিপ্রাকৃত শব্দের অর্থ, প্রকৃতির নিয়মিত বিধানের বাহির। এখন আদিম মনুষ্যের অবস্থা দেখা যাউক্। মনুষ্যের জ্ঞান যখন ইতরজীবের ন্যায় সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ ছিল, তখন সে প্রাকৃতিক নিয়মের অস্তিত্ব উপলব্ধ করিয়াছিল কি না সন্দেহ। ইতরজীবে ক্ষুধাতৃপ্তির ও অহোরাত্রির পর্য্যায় অনুভব করে, কিন্তু সেই পর্য্যায় যে একটা প্রাকৃতিক নিয়মের অনুগত, এতদূর বোধ তাহাদের জন্মিয়াছে বলা যায় না। কাল রাত্রি প্রভাত হইবে, এবং তখন ক্ষুধা উপস্থিত হইলে তাহার বন্দোবস্ত এখনি স্থির করিলে ভাল হয়,—ইতরজীবের এতটুকু বিচারশক্তি আছে স্বীকার করা যায় না। তবে কোন কোন জন্তু যে, ছয়মাস পূর্ব্বে আহারাদির সুবন্দোবস্ত করিয়া রাখে, সে স্বাভাবিক সংস্কারবশে, স্বভাবের অঙ্কুশ-তাড়নায়। আদিম মানবের অবশ্য এইটুকু অথবা ইহার উপরেও একটুকু উঠিবার সামর্থ্য ছিল। অহোরাত্রি, ক্ষুধাতৃপ্তি, শ্রমারাম, এবং আরও

কয়েকটা ব্যাপারের পর্য্যায় ও সেই পর্য্যায়ের নিয়মানুবর্ত্তিতা আদিম মানবের বুদ্ধিগত ছিল ধরিয়া লইতে পারি। কিন্তু এতদ্ভিন্ন অন্যান্য জাগতিক ব্যাপারে কোনরূপ সঙ্গতি বা পর্য্যায়, সমবায় সম্বন্ধ অথবা পারম্পর্য্য সম্বন্ধ, তাহারা দেখিতে পাইত, এরূপ বলা যায় না। মোটের উপর অধিকাংশ জাগতিক ব্যাপার তাহাদের নিকট ঘটিত এইমাত্র, তাহাদের অনুভূতির ভিতর আসিত এইমাত্র; যখন ঘটিত তখন তাহারা অনুভব করিত এইমাত্র। এই সকল জাগতিক ব্যাপার যে ঘটিবে, বা ঘটিবে না, অথবা কবে, কোথায়, কিরূপে ঘটিবে, এ সকল প্রশ্ন তাহাদের মনের মধ্যে কখন উপস্থিত হইত না। অর্থাৎ দুই একটা ঘটনা বাদ দিয়া বাকি সমস্ত তাহাদের অনুভূতির বিষয় ছিল মাত্র; তাহাদের বুদ্ধিপ্রয়োগের বিষয় ছিল না। তাহাদের নিকট সকলই প্রাকৃত ছিল, অতিপ্রাকৃতের অস্তিত্ব তাহাদের নিকট ছিল না। আমরা এখন অতিবুদ্ধিবলে অতিবলীয়ান্ হইয়া দর্পসহকারে বলিয়া থাকি, এ ঘটনা অসম্ভব। তাহাদের এরূপ দর্পপ্রকাশের কোনরূপ অবকাশ ছিল না। তাহাদের নিকট সকলই সম্ভব, সকলই বিশ্বাস্য ছিল। অতিপ্রাকৃত, অসম্ভব, অবিশ্বাস্য কিছুই ছিল না।

অর্থাৎ অতিপ্রাকৃতকে অতিপ্রাকৃত জানিয়াও, প্রকৃতির নিয়মের সহিত অসঙ্গত বুঝিয়াও, তাহাতে বিশ্বাস এক কথা; আর প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত এই ভেদবোধের অনুদয়হেতু সর্ব্বত্রই বিশ্বাস, সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। শক্তিবিশেষের আদেশে সূর্য্য আকাশমার্গে স্থির ছিল, ব্যক্তিবিশেষ মৃত্যুর পর অনুচরবর্গকে দেখা দিয়াছিলেন, ইত্যাদি আমরা অতিপ্রাকৃত বুঝিয়াও, কোন স্থানে মনের সহিত ঝগড়া করিয়া, কোন স্থানে অপরের সহিত

ঝগড়া বাধাইবার উদ্দেশে, বিশ্বাস করি। কিন্তু সে কালের মানুষের নিকট আহারনিদ্রাদি দৈনন্দিন অনুভূতিগোচর ঘটনার মত ঐ সকলও নৈসর্গিক ও সম্পূর্ণ সম্ভব বলিয়া গৃহীত হইত। এইরূপে দেখিলে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস মানুষের যে স্বাভাবিক তাহা বলা যায় না। অলৌকিক, অসাধারণ, কল্পিত ঘটনায় মানুষে যে বিশ্বাস করে, অতিপ্রাকৃতে স্বাভাবিক বিশ্বাস তাহার কারণ নহে। তাহা যে প্রাকৃত নহে, নিয়মসঙ্গত নহে, এই বোধের অনুৎপত্তিই তাহার প্রকৃত কারণ। অতিপ্রাকৃতকে মানুষ প্রাকৃত জানিয়াই বিশ্বাস করিতে যায়।

আদিম মানব সকল ঘটনাই সম্ভাব্য জানিত। আমরা সেই আদিম মানুষেরই বংশধর; কতকটা জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া কয়েকটা ধাপ উপরে উঠিয়াছি সত্য; কিন্তু প্রাচীন সংস্কার এখনও আমাদের অস্থিমজ্জা হইতে লুপ্ত হয় নাই। সুতরাং একটা নূতনতরো ঘটনা শুনিলেই তাহাকে উড়াইয়া দিতে হইবে, এরূপ বাক্যের সমর্থনে অনেকেই নারাজ।

আর একটা কথা। জ্ঞানের উন্নতিতে অনেক নূতন নূতন জাগতিক ব্যাপার আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতির গোচর হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে মানুষ সে সকলের অস্তিত্ব কল্পনায় আনাও কর্ত্তব্য বোধ করে নাই। এত নূতন নূতন ব্যাপার যখন দিন দিন আমাদের সম্মুখে আসিতেছে, তখন জগতে আরও কত কাণ্ড আছে কে বলিতে পারে? এখন যাহাকে অতিপ্রাকৃত বলিয়া উড়াইতে চাহিতেছ, কে বলিতে পারে দশ বৎসর পরে তাহাই প্রাকৃত বলিয়া গণ্য হইবে না? এই ত কিছু দিন আগে মেস্মার সাহেবকে লোকে প্রকাণ্ড বুজরুক্ মাত্র জানিত। কিন্তু আজ হিপ্‌নটিজম্ মিথ্যা বলিতে কে সাহস করে?

বিজ্ঞানের উন্নতিই অনেকটা অলৌকিকে বিশ্বাসিদলের মত পোষণ করিতেছে। এই ঘটনাটা প্রকৃতির নিয়মবহির্ভূত, এ কথা সাহস করিয়া বলা বড়ই অসমসাহসিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং অসাধারণ ঘটনামাত্র অবিশ্বাস্য এ কথা বলিও না। জগতে কি আছে, কি ঘটিতে পারে, এখন তুমি তাহার কি জান?

যাঁহারা এইরূপ যুক্তির অবতারণা করেন, তাঁহারা অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে বলেন না। ঘটনামাত্রকে অতিপ্রাকৃত বলিয়া উড়াইয়া দিতে নিষেধ করেন মাত্র।

বিখ্যাত ব্যাবেজ সাহেব একবার এইরূপে নিরাকরণের সমর্থন চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি নানাবিধ আঁক-কষা যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন। নির্দ্দিষ্ট নিয়মবলে সেই যন্ত্র আঁক কষিয়া উত্তর বাহির করিয়া দিতে পারে। একটি যন্ত্র এইরূপ। এক, দুই, তিন, এইরূপে আরম্ভ করিয়া পর পর সংখ্যা যন্ত্র হইতে বাহির হইতেছে। এগার হাজার সাত শ বাইশ পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে। তুমি এগার হাজার সাত শ তেইশের অপেক্ষায় বসিয়া আছ, এমন সময়ে অকস্মাৎ বাহির হইল তিন হাজার পাঁচ। তার পর আবার পূর্ব্বনিয়মে যন্ত্র চলিতে লাগিল। এই ঘটনাটা যন্ত্রের মিরাক্‌ল্। মিরাক্‌ল্ বটে, তবে নিয়মবহির্ভূত নহে। যন্ত্র এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত, যে, ঐ সময়ে এই রাশি বাহির না হইয়া ঐ রাশি বাহির হইবে। তবে যন্ত্রটির নির্ম্মাতা ভিন্ন অপর লোককে বেশ ঠকাইতে পারা যায়। যে জানে না, সে যন্ত্র বিকল হইয়াছে মনে করিতে পারে।

সুতরাং অনভিজ্ঞতার জোরে আমরা অনেক সত্য ঘটনাকে অলীক বলিয়া উড়াইতে চাই। কিন্তু সে কার্য্যটা প্রশংসার্হ নহে।

যাই হউক, অতিপ্রাকৃত, বাস্তবিকই অতিপ্রাকৃত, বস্তুতই প্রকৃতির সহিত সর্ব্বতোভাবে অসঙ্গত ঘটনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন কথা উঠিল না। যাহাকে আমরা অজ্ঞতাবশে প্রকৃতির নিয়মছাড়া বলিতে যাই, তাহা বস্তুতঃ নিয়মসঙ্গত হইতে পারে, ও অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য নহে; এই পর্য্যন্তই বলা হইল।

অতিপ্রাকৃত ঘটনা সম্ভব কি না তাহার একটু আলোচনা আবশ্যক হইতে পারে। আজকাল উন্নত দার্শনিক চিন্তা যত-দূর অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে এই প্রশ্নের উত্তর এইরূপে সংক্ষেপে দেওয়া যাইতে পারে।

প্রকৃতির নিয়মের সম্পূর্ণ বিরোধী ঘটনায় প্রত্যয় করিবার কোন কারণ নাই। তবে ইদানীং প্রাকৃতিক নিয়মে অভিজ্ঞতার অপেক্ষা অজ্ঞতার পরিমাণ অনেক বেশী। সুতরাং একটা নূতন কথা শুনিলেই সেটা অপ্রাকৃত বলিয়া উঠা অদূরদর্শিতার পরিচয়। আবার নূতন কথা শুনিলেই যে বিশ্বাস করিতে হইবে এমন নহে। তাহার সত্যতা সম্বন্ধে যথাসাধ্য অনুসন্ধান কর্ত্তব্য। হইতে পারে ঘটনার সাক্ষিগণ মিথ্যাবাদী, অথবা ইচ্ছাবশে বা অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রবঞ্চিত; হইতে পারে তাঁহাদের ইন্দ্রিয় কোনরূপে প্রতারিত হইয়াছে অথবা তাঁহাদের বোধশক্তি সুস্থ দশায় ছিল না। এইরূপে সমুদয় অনুসন্ধান করিয়াও যদি দেখা যায় ব্যাপারটা অমূলক নহে, তখন আমাদের প্রাকৃতিক নিয়মের অনভিজ্ঞতা স্বীকার করিতে হইবে। ব্যাপারটা প্রাকৃ-তিক নিয়মের বিরোধী বা অতিপ্রাকৃত বলিবার প্রয়োজন নাই।

কিন্তু এই পর্য্যন্ত বেশ সঙ্গত। কিন্তু এস্থলে একটু বক্তব্য আছে। আর একটু সূক্ষ্মদর্শনের আবশ্যকতা আছে। পরি-তাপের বিষয় বড় বড় পণ্ডিতে দার্শনিক বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া

এই সূক্ষ্মদর্শনটুকু প্রয়োগ করিতে ভুলিয়া যান। প্রকৃতি, প্রাকৃতিক নিয়ম প্রভৃতি কথাগুলি লৌকিক প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করিয়া অনর্থক গোলযোগে প্রবৃত্ত হয়েন। 'সৃষ্টি' শীর্ষক প্রবন্ধে পূর্ব্বে এই কথাটার অবতারণা করিয়াছি। বহিঃপ্রকৃতি অথবা জগৎ সর্ব্বতোভাবে মানবমনেরই সৃষ্ট এ কথাটা আমরা যখন-তখন ভুলিয়া যাই। জগৎ আমাদের বহিঃস্থ, স্বাধীন, স্বতঃসৃষ্ট, স্বতঃপ্রধান, স্বতন্ত্র অস্তিত্বযুক্ত একটা কিছু এই ধারণা-টাই আমাদের মনে সর্ব্বদা যেন জাগরূক থাকে। প্রকৃতপক্ষে আমার জগৎ, আমার প্রকৃতি, আমারই সৃষ্ট; তোমার জগৎ, তোমার প্রকৃতি, তোমারই সৃষ্ট। আমার জগৎ আমারই একটা অংশ, যাহা আমার সুবিধার জন্য আমি আমার বাহিরে কোন রকমে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছি। সেইরূপ তোমার জগৎ তোমারই প্রক্ষিপ্ত অংশমাত্র। আমার জগৎটা সর্ব্বাংশে তোমার জগ-তের অনুরূপ নহে। যেহেতু আমি সর্ব্বাংশে তোমার অনুরূপ নহি। আমার জগতে যে পরিমাণ নিয়মের অস্তিত্ব আমি অনু-ভব করি, সে আমারই কায়দা। তাহাতে আমারই সুবিধা। জগৎকে নিয়মানুযায়ী দেখিলে আমার জীবনযাত্রার যথেষ্ট সুবিধা ঘটে। অনিয়ত দেখিলে জীবনযাত্রা ভার হইয়া উঠে। সেই জন্য আমার জগৎকে আমি নিয়মানুযায়ী, নিয়মের অধীন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছি। আমার জগতে আমিই নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। আমার জগতের সহিত আমার নিত্য আদানপ্রদান, নিত্য কারবার চলিতেছে। সেই আদানপ্রদান ও কারবারের সুবিধার জন্য আমি নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। জগতের উপর আমার কতকটা প্রভুত্ব আছে। সেই প্রভুত্বের পরিমাণের উপর আমার জীবনের উৎকর্ষ নির্ভর করে। অথবা যে পরি-

মাণে জগতের উপর প্রভুত্ব চালাইতে পারি, সেই পরিমাণে আমার জীবন উন্নত, অভিব্যক্ত, সার্থক। এই প্রভুত্ব চালনার জন্য জগতে নিয়মের প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। সেইজন্য আমি নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। প্রকৃতি যেমন আমারই সৃষ্টি, প্রাকৃতিক নিয়ম ত তেমনই আমারই সৃষ্টি। যাহার জগৎ যে পরিমাণে নিয়মসঙ্গত হইয়াছে, সে সেই পরিমাণে জীবনসমরে বলীয়ান্। আমি নিয়মের স্থাপনা করিয়াছি, এবং জগতের যে অংশ এখনও নিয়মাধীনে আসে নাই, তাহাতেও নিয়মের প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় রহিয়াছি। সমগ্র জীবনীশক্তি এই চেষ্টার অনুকূল। প্রথমে যখন আমার জগৎনামধারী অংশটুকু আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন তাহার সবই এলোমেলো, বিপর্য্যস্ত, দেখি। ক্রমশঃ তাহাকে সুবিন্যস্ত, সুবিহিত, যথাদেশে যথা-কালে স্থাপিত করিয়া লই। আমার আত্মপ্রসারণের সহিত আমার জগতের পরিসর বৃদ্ধি পায়। আমি সেই জগতের কেন্দ্র-স্থলে উপবিষ্ট হইয়া আশেপাশে হাত বাড়াইয়া যথাসাধ্য গোছা-ইয়া, বিধানানুগত করিয়া, আয়ত্ত করিয়া লই। যতদূর সাধ্য। সবটাকে আয়ত্ত করিতে পারি না। আশেপাশে, নিকটে যতটুকু আছে, তাহাকে বিধানবিন্যস্ত করি। জগতের কেন্দ্র-স্থলের দূরদেশে, পরিধির নিকটে, যেখানে হাত বাড়াইতে সকল সময়ে পারি না, সেখানে এমন অনেক জিনিষ রহিয়া যায়— যাহা আমার নিয়মের ভিতর টানিয়া আনিতে পারি না। সেখানে আমার প্রভুত্ব বড় খাটে না। সেই অনিয়ত জিনিষ-গুলা আমার অধীন হয় না। তাহাদের লইয়া আমার জীবনের কাজ করিতে পারি না। অনেক সময় তাহারাই অতর্কিত ভাবে আমার উপর প্রভুত্ব চালায়। আমি ভুলিয়া যাই, যে,

আমারই সৃষ্টপদার্থ আমাকে আক্রমণ করিতেছে। ভুলিয়া যাই, যে, আমার শক্তির অভাবে যাহাদিগকে আমার প্রতিষ্ঠিত নিয়মাধীনে অদ্যাপি আনিতে পারি নাই, তাহারাই আমাকে জীবনযাত্রায় প্রতিরোধ করিতেছে, আমার জীবনপন্থা কণ্টকিত করিতেছে। আমি নিজের ছায়া দেখিয়া বালকের মত ভয় পাইতেছি। নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া উপাখ্যানের কুকুরের মত প্রতারিত হইতেছি। আপন প্রতিবিম্বের বিভীষিকা দেখিয়া উপাখ্যানোক্ত সিংহের মত নিজের জীবন বিসর্জন করিতেছি। ইহাদিগকেই আমরা ভয় করি, ইহাদের স্পর্শে আমাদের আতঙ্ক জন্মে; ইহাদের দর্শনে আমাদের রোমাঞ্চ হয়। কেন না, ইহারা এখনও নিয়মের বশে আইসে নাই, এখনও জীবনের অনুকূল হয় নাই, এখনও জীবনের প্রতিকূলতা করিতে ছাড়ে না। ইহাদিগকে দেখিয়া সময়ে সময়ে শিহরিয়া উঠি, বলি ইহারা মিরাক্‌ল্‌, ইহারা অতিপ্রাকৃত। অতিপ্রাকৃত এই অর্থে, যে, এখনও প্রকৃতির নিয়মের অনুগত হয় নাই। 'অতিপ্রাকৃত রহিবে কি না, আমার নিজের শক্তির উপর নির্ভর করে। আমার শক্তি থাকে কালে অতিপ্রাকৃতকে প্রাকৃত করিয়া লইব, শক্তি না থাকে, অতিপ্রাকৃতই রহিবে।

আমার জগৎ সর্ব্বাংশে তোমার জগতের অনুরূপ নহে। আমার জগৎ যত বড়, তোমার ঠিক্ তত বড় নহে। হয় ত আমার জগতের দেশগত পরিসর অধিক; হয় ত আমার জগতের কালগত বিস্তৃতি অধিক। সে আমার আত্মোৎকর্ষের পরিচয়। আমার জগতের ভিতর যা যা আছে, তোমার জগতের ভিতর যে ঠিক্ তাই তাই আছে, তাহার কারণ নাই। আমার জগতে আমার প্রত্যক্ষ, আমার অনুভূতির বিষয় যাহা যাহা আছে,

তোমার জগতে তোমার প্রত্যক্ষ, তোমার অনুভূতির বিষয় সে সব নাই। আবার তোমার জগতে যাহা আছে, আমার জগতে তাহা নাই। তুমি যাহা দেখিতে পাইতেছ, আমি তাহা দেখিতে পাই না। তাহা বলিয়া তোমাকে মিথ্যাবাদী, অথবা প্রতারিত, অথবা বিকৃতেন্দ্রিয়, অথবা বিকৃতবুদ্ধি বলা আমার সাজে না। আমার পক্ষে আমার জগৎ যেমন সত্য, তোমার পক্ষে তোমার জগৎ তেমনি সত্য। জাগ্রতের পক্ষে তদানীং অনুভূত জগৎ যেমন সত্য, সুপ্তের পক্ষে স্বপ্নদৃষ্ট জগৎ তেমনই সত্য। আমার নিকট আমার সুনিয়ত, সুব্যবস্থ, জীবনানুকূল, জগৎ যেমন সত্য; পাগলের পক্ষে তাহার অনিয়ত, অব্যবস্থ, জীবনীশক্তির প্রতিকূল জগৎ তেমন সত্য। তবে পাগলকে অবজ্ঞা করি কেন? তাহার কারণ, আমি জীবনসমরে সমর্থ, আর সে অসমর্থ।

এখনও যে মনুষ্যজাতি অতিপ্রাকৃতের বিভীষিকা দেখে, সে বিভীষিকা অলীক নহে। যে দেখে সে মিথ্যাবাদী না হইতে পারে, কিন্তু সে অশক্ত। যে যে পরিমাণে দেখে সে সেই পরিমাণে অশক্ত। মনুষ্যজাতির শক্তিসঞ্চয়ের সহিত অতিপ্রাকৃতের সংখ্যা ও পরিমাণ কমিয়া যাইবে সন্দেহ নাই। তবে মানবাত্মার পরিসর কখন্ শেষ সীমা প্রাপ্ত হইবে, মানব কোন্ সময়ে সৃষ্টিশক্তি হইতে বঞ্চিত হইবে তাহা বলিতে পারি না। যে পর্য্যন্ত সেই শেষ দিন না আইসে, সে পর্য্যন্ত প্রাকৃতের সহিত অতিপ্রাকৃত বর্ত্তমান থাকিবে, সন্দেহ নাই।

---

# ভারতবর্ষে—জয়পুর।

"কলিকাতায় ইংরাজী ভারতবর্ষ; কাশীতে ব্রাহ্মণের ভারতবর্ষ; আগ্রায় মোগলের ভারতবর্ষ; এখানে রাজাদের ভারতবর্ষ, উপন্যাসের ভারতবর্ষ, গীতি-নাট্যের ভারতবর্ষ। ...... এই রাজপুতানাকে কেহই জয় করিতে পারে নাই। কত বিভিন্ন জাতি ভারতবর্ষের প্রভু হইল, কিন্তু সকলেরই বিরুদ্ধে রাজপুতেরা আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। রামায়ণের পৌরাণিক যুগে ইহারা যে আর্য্য জাতি ছিল, এখনও ইহারা সেই আর্য্যজাতিই আছে। এখানকার রাজার বংশ-সূত্র ১৩৯ পুরুষ ভেদ করিয়া সূর্য্যবংশে সমুত্থিত—যে সূর্য্যবংশ হইতে মহানুভব রামচন্দ্রের উৎপত্তি। ইনি এখনও, সেই পুরাতন হিন্দু রাজাদের প্রথা-অনুসারে, মনুর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া রাজ্য শাসন করিয়া থাকেন। রাজার অধীনস্থ ঠাকুরেরাও চন্দ্র সূর্য্য বংশ হইতে প্রসূত—ইঁহাদেরও বংশাবলী কালের অন্ধকারে মিলাইয়া গিয়াছে। এখানকার সাধারণ লোকেরাও গৌরবর্ণ আর্য্যজাতি হইতে প্রসূত—ইহারা বিভিন্ন শ্রেণীতে ও গোত্রে বিভক্ত। রাজপুতমাত্রই জাতিতে ক্ষত্রিয়। এই যোদ্ধৃ-জাতি ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কাহাকেও আপনাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে না। এই নিমিত্ত, এখানকার একজন কৃষকও আপনাকে রাজার সমকক্ষ বলিয়া মনে করে; "রাজপুত" অর্থাৎ রাজপুত্র বলিয়া আপনার পরিচয় দেয়। ইহাদের মধ্যে সদর্প পুরুষোচিত আত্ম-মর্য্যাদার ভাব বিদ্যমান; একটি অশ্ব, একটি বল্লম, একটি ঢাল ইহাদের সম্বল; যুদ্ধ উপস্থিত হইলে,

ইহারা নিজ-নিজ গোত্র-পতির অধীনে যুদ্ধে অগ্রসর হয়; আপনাদের নগর ও দেবতাকে রক্ষা করিবার জন্য পিতৃস্বরূপ রাজার পতাকাতলে আসিয়া সম্মিলিত হয়।

হোটেল হইতে জয়পুরের যাহা কিছু দেখিতে পাই তাহাতে মনে হয় যেন একটি নূতন জগতে আসিয়াছি। সাদা সাদা ছোট ছোট দুর্গভূষিত পাহাড় এবং দুর্গের বুরুজ দিগন্তে বিস্তৃত। য়ুরোপীয় মধ্যযুগের সরঞ্জাম এই উষ্ণ প্রাচ্যদেশে দেখিব আশা করি নাই। রাস্তায় ছোট ছোট গাধার পাল, তাহার মধ্যে দলে দলে স্ত্রীলোকেরা গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে; সওয়ারেরা উৎকৃষ্ট আরব ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়াছে; কোমরবন্ধে ঢাল, পার্শ্বে তলবার, মাথায় লাল পাগুড়ি, ইহাদের বড় বড় দাড়ি বিভক্ত হইয়া দুই পাশে বিস্তৃত—এবং বামে ডাহিনে কাঁটার ন্যায় খাড়া হইয়া উঠিয়াছে; ইহারা খুব আস্ফালন সহকারে চলিয়াছে। ভারতবর্ষে আসিয়া সাধারণ লোকের মুখে যেরূপ স্ত্রী-সুলভ কোমলতা, আলস্য ও স্বপ্নময় ভাব সচরাচর দেখা যায়, ইহাদের মুখে সেরূপ কোন ভাব নাই। ইহারা খুব কার্য্যতৎপর। পেয়াদা, ঘোড়-সওয়ার, উট, হাতী, বড় বড় প্রকাণ্ড গরুর গাড়ি, এবং ছোট ছোট গাধায় রাস্তা ভারাক্রান্ত; ধূলা ও রৌদ্রের মধ্য হইতে ইহাদের গোলযোগ শোনা যাইতেছে।

রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে আধ ঘণ্টার মধ্যেই দুর্গবদ্ধ-নগর-প্রাচীরের একটি তোরণের নিকট আসা যায়। সমুচ্চ বুরুজ-শ্রেণীর তল দিয়া একটি দুর্গ-সেতু পার হইতে হয়, তাহার পর একটি ভিতরকার প্রাঙ্গণ, সেই প্রাঙ্গণে উটেরা বোঝা খালাস করিবার জন্য হাঁটু গাড়িয়া বসিয়াছে। এই প্রাঙ্গণ পার হইবামাত্র গীতিনাট্যের দৃশ্য-পটের ন্যায় হঠাৎ একটা অদ্ভুত

অপরূপ, কুয়াশাবৎ, বর্ণনাতীত দৃশ্য নেত্রসমক্ষে উপস্থিত হয়।

গোলাপি রঙের দৃশ্য সর্ব্বপ্রথমেই নেত্রসমক্ষে উপস্থিত। এখানে সকলই গোলাপী। পাঠক যেন কল্পনা করেন, এখানকার যে কোন ছবি তাঁর সম্মুখে ধরিব, সকলই গোলাপী রঙে চিত্রিত। সুপ্রশস্ত রাজপথের দুই ধারে গোলাপী বাড়ি, গোলাপী দেবমন্দির, গোলাপী প্রাসাদ, গোলাপী সৌধ-চূড়া এবং গোলাপী তাম্বু-আকারের গৃহ। এই গোলাপী রং একটু ফিকে ও কোমল ও সুকুমার ধরণের; এই রংটি রাস্তার এক সীমা হইতে আর এক সীমা পর্য্যন্ত বরাবর সিধা চলিয়াছে। গোলাপী বাড়ি, দোকান, সব ঘেঁষাঘেঁষি পাশাপাশি সিধাভাবে চলিয়াছে, ক্রমে সমস্তই যেন অপূর্ব্ব গোলাবী রঙের বাষ্পে মিলাইয়া গিয়াছে। এই রঙীন বাষ্পের মধ্যে একটিও কালো দাগ নাই, একটিও বিলাতী গাড়ি নাই; রাস্তার জনতার মধ্যেও বিচিত্র বর্ণের ছটা ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। রাস্তার দুই ধারের বাঁধানো পদপথের উপর খোলা বাজার বসিয়াছে, দোকানদারেরা হাঁটু গাড়িয়া সারি সারি বসিয়া আছে এবং সেই পদপথের উপর বিছানো লাল নীল রঙের শতরঞ্চির উপর নানা প্রকার চাকচিক্যময় দ্রব্য সাজানো রহিয়াছে। জরির চটি জুতা, রাশীকৃত কলা ও নারিঙ্গি নেবু, রংকরা মূর্ত্তি, রৌদ্রদগ্ধ নানা প্রকারের কাপড়, কি বামে কি ডাহিনে যে দিকে চাই, সকলই চক্‌চক্‌ করিতেছে, ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে। একটি সমস্ত দিন ধরিয়া জয়পুরে ঘুরিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা করে—সমস্ত জিনিসের খুঁটিনাটি মনে করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে। এখানে চক্ষুর ক্লান্তি উপস্থিত হইবার সময় নাই। আমি কোচ্‌মানকে এত

বলিতেছি "আস্তে আস্তে"—তবু সে গাড়ি শীঘ্র হাঁকাইবে। শেষে কি করি, গাড়ি হইতে নাবিয়া পড়িলাম—এবং আপনার ইচ্ছামত ঢিমাচালে চলিতে লাগিলাম।

রাজপুত ঠাকুরেরা ও কর্ম্মচারীগণ, নাটকের অভিনেতাদিগের ন্যায়, ফুল-কাটা জরির পোষাক-পরিহিত এবং ইহাদের বিপুল গর্ব্বিত শ্মশ্রুরাজি হাত-পাথার আকারে মণ্ডলাকারে বিস্তৃত; মসৃণদেহ সুন্দর অশ্ববৃন্দ—ঢাল-তলোয়ারধারী ঔপন্যাসিক সৈনিকগণ, বিদ্যালয়ের ছাত্র, প্রাসাদের রক্ষীদল, নগ্নশিশু ক্রোড়ে করিয়া অশ্বারোহী স্ত্রীলোক—এই সমস্ত পাৎলা কুয়াশা-চ্ছন্ন রাস্তা দিয়া সারি সারি চলিয়াছে। দোকানদারেরা তাহা-দিগের দোকান হইতে হাত বাড়াইয়া সস্মিত মুখে আমাকে নানাপ্রকার রংকরা পাথরের দেবমূর্ত্তি প্রদর্শন করিতেছে, সকল দেয়ালে নীলরঙ্গে নানাপ্রকার ছবি আঁকা: হাতি, চিতা, গাছ, রেলগাড়ির কল—হাস্যজনক বড় বড় আলখাল্লা-কোর্ত্তা-পরা টক্‌টকে লাল আড়ষ্টভাবে-দণ্ডায়মান য়ুরোপীয় মূর্ত্তি চিত্রিত। ৩০ বৎসর বয়সের পূর্ণবয়স্ক লোকেরা ঘুড়ি উড়াইতেছে ও স্কুলের ছাত্রদিগের ন্যায় রাস্তায় ছুটাছুটি করিতেছে। এই সমস্ত শিশু-প্রকৃতি লোকেরা হাসিতেছে খেলিতেছে—ইহাদিগকে দেখিয়া মনে হয় কোন কবি অদ্ভুত-রসপূর্ণ কল্পনার খেয়ালে এমন একটি স্বপ্নজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন যেখানে সকলই লঘুপ্রকৃতি, অদ্ভুত, সুখী, হাওয়ার ন্যায় ফুর্‌ফুরে—যেখানে কোন দুঃখ নাই, কোন কুৎসিত বস্তু নাই। এই জগতের লোকেরা জন্তুদিগের সহিত ভ্রাতৃভাবে একত্র বাস করিতেছে, ইহারা আমাদিগের অপেক্ষা ঢের সরল ও খোলা-প্রাণ। এই দেখ ছোট ছোট গাধা ও উটের সারি—উটেরা হেলিয়া দুলিয়া ধীরগতিতে চলিয়াছে এবং রাস্তার

ভীড় ছাড়াইয়া আপনাদিগের উন্নত কণ্ঠ উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়াছে; গৃহের ছাদে কটা কটা বানরেরা বসিয়া আছে; ঐ দেখ কতকগুলি গরু, উহাদের বড় বড় হরিবর্ণ সিং—উহাদের দেহ সমস্ত সাদা—মনে হয় যেন মার্ব্বল পাথরে খুদিয়া গঠিত।

কতকগুলি কুকুর দেখিলাম, তাহাদের গা হল্‌দিয়া, নীল ও লাল রঙ্গে রঞ্জিত। আর একটু দূরে একটা চকের মধ্যে পায়রার ঝাঁক দেখিতে পাইলাম, বৃহৎকায় হস্তীরা যাইবামাত্র তাহারা উড়িয়া অন্যত্র বসিতেছে। এই সকল জীবন্ত পশুপক্ষীর মধ্যে, দেবত্বপ্রাপ্ত বৃক্ষ, হস্তী, বানর প্রভৃতির ক্ষুদ্র মূর্ত্তিসকলও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। একটা বৃহৎ চৌমাথা রাস্তা—এই চৌমাথা দিয়া আর একটা রাস্তা ধরা গেল। এ রাস্তাটাও পূর্ব্বের ন্যায় বৃহৎ, সিধা ও গোলাপী রঙ্গে রঞ্জিত। এখানেও কতকগুলি মন্দির দেখিলাম, হস্তীর প্রস্তরমূর্ত্তিসকল মন্দিরের পাদদেশে প্রতিষ্ঠিত। এই গোলমালের সীমা নাই—পথিকের দল, ফুলের রাশি, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, রাস্তায় ঘোড়সওয়ার, দোকানদার প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। পায়রার ঝাঁক মাটিতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইতেছে, তাহার মধ্যে শত শত নিদ্রালু নির্ব্বোধ গাভী শয়ান—লোকজনের গোলমালে তাহাদের ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। কতকগুলি বালক লম্বা কচি কচি বাঁশের ডাল লইয়া দণ্ডায়মান—ভক্তেরা সেই সকল ডাল ক্রয় করিয়া গাভীদের পদতলে উপহার দিতেছে; গাভীরা ঋণস্বরূপ উহা গ্রহণ করিয়া প্রশান্তভাবে চর্ব্বণ করিতেছে। বৃক্ষশাখা হইতে শেওলা-পড়া মাটির ভাঁড়সকল ঝুলিতেছে, তাহার উপর ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া পাখি আসিয়া বসিতেছে—তাহাদের গোলগোল সুন্দর মাথার চারিধারে লোহিত রেখার বের।......হঠাৎ ঘোড়ার পদক্ষেপশব্দ—এই গর্ব্বিত অশ্বারোহীবৃন্দ না জানি কারা! অশ্বদিগের মসৃণ গাত্র

চিক্‌চিক্ করিতেছে—সুন্দর অশ্বারোহীদিগের অস্ত্র সকল ঝক্‌ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে। ইনি রাজার ভ্রাতা—ইঁহার পশ্চাতে রাজপুত ঠাকুরেরা, পুরোভাগে আসা-সোটাধারী পদাতিকেরা দৌড়িতেছে। ইহাঁর মাথায় মখ্‌মলের পাগ্‌ড়ি—গায়ে সবুজরঙের ফুলকাটা চাপকান, নিজ অশ্বকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া নাচাইয়া নাচাইয়া চালাইতেছেন। ক্ষণকালের জন্য ইঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম। ইঁহার উদার সাহসিক মুখশ্রীতে উচ্চকুল, পুরাতন শোণিত, চিরাভ্যস্ত প্রভুত্বের ভাব যেন স্পষ্ট অনুভব করা যায়। ইনি একজন প্রকৃত ক্ষত্রিয়, ভারতবর্ষের আদিম বিজয়ীগণের সাক্ষাৎ বংশধর।

হস্তিবৃন্দ হস্তিশালায় প্রবেশ করিল। ঐ দেখ, সাতটা হস্তী—কৃষ্ণবর্ণ প্রকাণ্ড স্তূপ, গম্ভীর "ফিলজফর", ধীরগতি, স্বকীয় দেহনিম্নস্থ কোলাহলময় তাবৎ জীবপ্রবাহের উপর কৃপাদৃষ্টি করিতেছে। শুণ্ডদ্বারা মৃত্তিকা ঈষৎ ছুঁইয়া, প্রকাণ্ড মস্তকের উপর মাহুতকে ধারণ করিয়া ইহারা একে একে দ্বারমধ্যে অন্তর্হিত হইল। মানুষের ন্যায় পা নোয়াইয়া, কোমল পদতল ধীরে ধীরে বাহির করিয়া, ইহারা চলিতে থাকে—ছায়ার ন্যায় একেবারে নিস্তব্ধ। ইহাদের প্রকাণ্ড বিষণ্ণ মস্তকের অভ্যন্তরে না জানি কি গভীর চিন্তা প্রবাহিত হইতেছে, ইহাদের সম্মুখ হইতে যে নিকৃষ্ট জীবজন্তু লোকজন সরিয়া যাইতেছে তাহাদের প্রতি দৃক্‌পাৎ নাই। ইহাদিগকে দেখিলে বুঝা যায় কেন গজমুণ্ডধারী গণেশ জ্ঞানের দেবতা হইয়াছেন। ... ... ... ...

প্রতিমুহূর্ত্তে চিত্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আমি এই চলন্ত ছবি আঁকিবার চেষ্টা করিতেছি। প্রাসাদের একটা উচ্চ দ্বারের সম্মুখে স্থূল-চর্ম্মী জন্তুসকল, উষ্ট্র, লোকজন, বাজপক্ষীর ঝাঁক্।

তোরণের উপরে কুলাঙ্গির অভ্যন্তরে একটা লোহিত হস্তিমূর্ত্তি সুসুপ্ত—তাহার সম্মুখে লোকেরা ঘুরিতেছে, চীৎকার করিতেছে। এবং তীক্ষ্ণধ্বনি তূরি ভেরী হইতে হিন্দু সঙ্গীত উত্থিত হইতেছে।

সেই প্রশস্ত মুক্তস্থানের চতুর্দ্দিকে, মন্দির, স্মরণস্তম্ভ, বিশ্ব-বিদ্যালয়, প্রাসাদশ্রেণী বিরাজিত। ইহাদের মধ্যে একটি অট্টালিকা ঘোর গোলাপীবর্ণ, পিরামিডের ন্যায় সমুত্থিত। ইহার নয় তলা ও শতচূড়া এবং ইহার চৌষট্টি বহিরুদ্গত গবাক্ষদ্বার; ইহা বারাণ্ডা, স্তম্ভশ্রেণী এবং প্রস্তর-খোদিত শত শত পুষ্পের দ্বারা বিভূষিত। সমস্ত গঠনপ্রণালী বাষ্পবৎ, বায়ুবৎ লঘু, অসাধারণ ও অদ্ভুত। ইহা বায়ু-প্রাসাদ। এই নামটি অতি সুন্দর। এই প্রকার, নগরের চারিধারের ছোট ছোট পাহাড়ের উপর মেঘ-প্রাসাদ ও সূর্য্য-মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। নগরের অপর প্রান্তে যে গোলাপীরঙ্গের দ্বার দেখা যায় তাহার নাম পান্না-দ্বার। আমরা যেন প্রাচ্যদেশের পরী-উপাখ্যানের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি।

তূরীনিনাদ শোনা যাইতেছে। করতালের এরূপ ঘোরতর রব হইতেছে যে, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিতে হয়। শব-সহগামী এক দল উল্লাসপূর্ণ বাদক দ্রুতপদে চলিয়াছে—সূক্ষ্ম শুভ্র বস্ত্রে আচ্ছাদিত মৃতদেহকে বাঁশে বাঁধিয়া লোকেরা লইয়া যাইতেছে। পরিবারবর্গ করতাল বাজাইতে বাজাইতে, লাফাইয়া লাফাইয়া চলিয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে "রাম রাম" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। শববাহীদল অন্তর্হিত হইল। এক্ষণে দেখিতেছি, শৃঙ্খলবদ্ধ শিকারী কুকুরবৃন্দ—বেগুনি রঙ্গের পরিচ্ছদে আবৃত। উদ্যানে খাটিয়ার উপর, মহারাজার

শিকারী নেকড়ে বাঘ, স্থনম্য কৃশদেহ অদ্ভুত জীব, দেখিতে উদার-প্রকৃতি, ইহাদের তীক্ষ্ণচক্ষে যেন বিদ্যুৎ খেলিতেছে—ইহাদের রক্ষকেরা মুটো বাড়াইয়া দিতেছে, আর ইহারা কণ্টকিত জিহ্বার দ্বারা তাহা চাটিতেছে। অন্যত্র, একটা বিবাহ-ব্যাপার! চল্লিশ জন গায়িকা স্ত্রীলোক, জরদ রঙ্গের রেশ্‌মি কাপড়ে সজ্জিত হইয়া ভূমিতলে বসিয়া আছে। কন্যার বয়স দশ বৎসর, সে কেবল গায়িকাদিগের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। রাস্তার শেষভাগে পদ-পথের উপর একটা গরাদের পিছনে, দশটা নরাহারী ব্যাঘ্ররাজ মস্তক নত করিয়া তাহাদের কারাগৃহের মধ্যে ধীরে ধীরে পায়চালি করিতেছে। লোকেরা উহাদিগকে "সাহেব" অর্থাৎ প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিতেছে—"সাহেব" নামের উপযুক্ত বটে। উহাদের মধ্যে যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা দেখিতে ভাল, সে ষোলটা স্ত্রীলোককে বধ করিয়াছে। ... ...

এই বিচিত্র দৃশ্যের মধ্যে, একটি দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায়—সে দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর। ছোট ছোট ছেলেদের নগ্নদেহের কি নমনীয়তা, কি লাবণ্য! যত দেখি ততই ভাল লাগে—দেখিয়া ক্লান্ত হই না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদিগের সুগোল ট্যাবাটোবা ক্ষীণদেহ দেখিতে অতি চমৎকার। দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ কেশগুচ্ছ তাহাদের সুন্দর বিহ্বল মুখের উপর এবং সুকুমার-গঠন সুন্দর বক্ষের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সেই নবীন পেশীরাশি ও শোণিতের বল ও স্বাস্থ্য যেন স্পষ্ট অনুভব করা যায়। সে অতি চমৎকার। তাহাদের শ্যামবর্ণ দেহচর্ম্ম, আলোক ও বিশুদ্ধ বায়ুতে আচ্ছন্ন—তাহাতে আলোক ও ছায়া কেমন সুন্দররূপে মিশিতেছে। যুবতী স্ত্রীলোকদিগের বক্ষের নিম্নদেশ হইতে উদরের মধ্যদেশ পর্য্যন্ত অনারৃত—তাহারা যেরূপ পরিচ্ছদ পরে তাহা অতি সুন্দর।

তাহাদের পরিহিত কোমল পরিচ্ছদ যেরূপ দেখিতে মধুর, নয়ন-তৃপ্তিকর, সাদাসিধা ও শান্তিময় এমন আর কোথাও নাই। যে সকল বালিকারা অপেক্ষাকৃত কৃশ, তাহাদের আভ্যন্তরিক দেহপঞ্জরের আন্দোলন স্পষ্ট যেন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

একটা মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম, তাহার প্রকাণ্ড সোপান রাস্তা পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছে। নিম্নদেশে, উষ্ট্রেরা হাঁটু গাড়িয়া ঘুমাইতেছে এবং সোপানের ধাপের উপর কুকুরেরা রৌদ্রে শুইয়া আছে। সোপান দিয়া উঠিয়া একটা প্রাঙ্গণের সমুখে আসিলাম, সেই মার্বল-আচ্ছাদিত প্রাঙ্গণে গাভীবৃন্দ মুক্তভাবে বিচরণ করিতেছে। ইহার এক কোণে দুইটি পবিত্র বৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত—একটি পুরুষ-বৃক্ষ বট এবং আর একটি স্ত্রী-বৃক্ষ, তাহার নাম পিপ্পল। একজন বৃদ্ধা প্রথম বৃক্ষটির চারিদিকে দ্রুতভাবে প্রদক্ষিণ করিতেছে, আর একটি বৃদ্ধা দ্বিতীয় বৃক্ষটির পাতায় জল ঢালিতেছে। ইহার ধারে আর একটি দ্বিতীয় প্রাঙ্গণ, ইহা স্তম্ভ-পরিধৃত বারাণ্ডার দ্বারা বেষ্টিত—এইখানে, ছায়াতলে বসিয়া লোহিতবসনাবৃত কতকগুলি স্ত্রীলোক পুরোহিতের মুখ হইতে নাকীসুরে উচ্চারিত রামায়ণ-গান শান্তভাবে শুনিতেছে। ঘোমটার নীচে যে সুন্দর মুখগুলি দেখা যাইতেছে, তাহারা যে খুব ধ্যানে মগ্ন এরূপ বোধ হয় না। এখানে সকলে এক পরিবারের মত অবস্থিত। পুরোহিতের গলায় মালা, তিনি আসনে উপবিষ্ট, রামায়ণ পড়িবার সময় কখন সুর উচ্চে উঠিতেছে, কখন বা নীচে নাবিতেছে—এবং সেই ছন্দানুসারে তাঁহার দেহ আন্দোলিত হইতেছে। অনেকগুলি চড়াইপাখী এই ভক্তবৃন্দের মধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে, এবং বড় বড় কাক, নিদ্রিত গরুদের কাঁধের উপর লাফাইয়া লাফাইয়া বসিতেছে। হিন্দু-

ধর্ম্মেরই এইটি বিশেষ লক্ষণ, এই ধর্ম্ম মুক্তবায়ুতে অনুষ্ঠিত, এই পূজার পবিত্র স্থান—এইখানে, মন্দুরা, পক্কশালা ও মন্দির সকলই একত্রিত। পুরোহিতের পশ্চাতে, দালানের প্রান্তদেশে, অন্ধকারাবৃত একটা দেব-সিংহাসন তাহাতে একটা পুত্তলিকা দেখিতে পাওয়া যায়—কালো-মুখ-ওয়ালা একটি ছোট পুতুল পার্ব্বতী, লাল-কাপড়-পরা—দুটি সিংহ পাহারা দিতেছে। তাঁহার নীচে তাঁহার স্বামী, মহাদেব; স্বয়ং মহাদেব নহে—তাঁহার লিঙ্গমূর্ত্তি স্থাপিত। লিঙ্গমূর্ত্তি, প্রাণের রূপক চিহ্ন। বন্ধ্যা স্ত্রী-লোকেরা, এবং স্বামী-প্রার্থী যুবতীরা এইখানে প্রার্থনা করিতে আইসে।

---

# সাংখ্যদর্শন।

## ॥ ২১ ॥ সাংখ্যদর্শনের "গুণ" ॥

এই প্রবন্ধমালায় সাংখ্যদর্শনের "গুণ" শব্দের যেরূপ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে (৪র্থ প্রবন্ধ দেখুন) তাহার প্রামাণিকতা বিষয়ে কেহ কেহ সন্দেহ করিতে পারেন। অনেকে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের "গুণের" সহিত সাংখ্যদর্শনের "গুনের" গোলমাল করিয়া বসেন। অনেক ইংরাজি অনুবাদেও সাংখ্যদর্শনের "গুণ"কে quality বলিয়া লিখিত হইয়াছে। আমার বিবেচনায় ইহা ভ্রম!

কপিলের এক প্রসিদ্ধ সূত্র এই;—

সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ ইত্যাদি ॥ ১—৬১ ॥*

---

* এই সূত্র পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝা যায় যে, সত্ত্বাদিকে quality বলিলে—প্রকৃতিকেও quality বলিতে হয়—কেন না, গুণের অবস্থা কখনও দ্রব্য হয় না।

ইহার ভাষ্য এইরূপঃ—

সত্ত্বাদি দ্রব্যাণাং যা সাম্যাবস্থা অন্যূনাতিরিক্তা অবস্থা অকার্য্যাবস্থা ইত্যর্থঃ। এবং চ কার্য্যভিন্নং গুণত্রয়ং প্রকৃতিঃ ইতি পর্য্যবসিতোঽর্থঃ॥"

পাঠকগণ দেখিবেন এখানে স্পষ্টাক্ষরে সত্ত্ব রজস্ ও তমস্‌কে দ্রব্য বলা হইয়াছে। পাছে স্থূলদর্শী পাঠকের সম্যক হৃদয়ঙ্গম না হয় তজ্জন্য ভাষ্যকার আবার চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া বলিতেছেন—

"সত্ত্বাদীনি দ্রব্যানি—ন বৈশেষিকা গুণাঃ। সংযোগবিভাগবত্ত্বাৎ—লঘুত্ব গুরুত্বাদি ধর্ম্মকত্বাচ্চ। তেষু অত্র শাস্ত্রে শ্রুত্যাদৌ চ গুণশব্দঃ পুরুষোপকরণত্বাৎ পুরুষপশুবন্ধক ত্রিগুণাত্মক মহাদাদিরজ্জু নির্ম্মাতৃত্বাচ্চ প্রযুজ্যতে॥"

অর্থাৎ কেবল "গুণ" এই শব্দের ব্যবহার দেখিয়া সাংখ্য-শাস্ত্রের গুণকে বৈশেষিক বা ন্যায়দর্শনের গুণ বলিয়া ধরিও না। সাংখ্যদর্শনে যাহাকে "গুণ" বলে তাহা বাস্তবিক ন্যায় ও বৈশে-ষিক দর্শনের দ্রব্যের সমতুল্য। কেন না, এই সকল "গুণ" পরস্পর সংযুক্ত বিযুক্ত হয়; ইহাদের "গুরুত্ব" "লঘুত্ব" আদি বৈশেষিক দর্শনসম্মত গুণ আছে। পুরুষের উপকরণ হেতু বা পুরুষকে রজ্জুর ন্যায় বন্ধন করে বলিয়া ইহাদিগকে গুণ বলা যায়। ফলতঃ ভাষ্যকার এস্থানে "গুণ" শব্দের যে অর্থ দিয়াছেন তাহা ঠিক। আমিও গুণ শব্দের অবিকল এই অর্থ বুঝিয়াছি। কিন্তু ভাষ্য-কার সত্ত্বাদিকে গুণ বলার যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা ভুল বলিয়া মনে হয়। রূপক ধরিয়া গুণের অর্থ করার কোন আবশ্যক নাই। সরল অর্থে "গুণের" বিপরীত "প্রধান"। তাহার প্রমাণ;—

"আপেক্ষিকো গুণপ্রধান ভাবঃ ক্রিয়াবিশেষাৎ" ॥ ২—৪৫

সূত্রে দ্রষ্টব্য। প্রকৃতি = প্রধান; সত্ত্বাদি = গুণ। অর্থাৎ গৌণ বলিয়াই সত্ত্বাদির নাম "গুণ"। সত্ত্ব রজস্ তমসের সাধারণ

নাম প্রকৃতি; প্রকৃতি বলিলে উক্ত তিন পদার্থেরই অবস্থাবিশেষ বুঝায়। প্রকৃতি নামক প্রধান শ্রেণীর অন্তর্গত গৌণ শ্রেণীর পদার্থ—সত্ত্ব রজস্ তমস্ ইতি। ফলতঃ বড় বড় পণ্ডিতেও সাংখ্য-দর্শনের "গুণ" ও ন্যায়দর্শনের "গুণ"কে যে এক বলিয়া ভ্রান্ত হয়েন—ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ইহাতে এইমাত্র প্রকাশ পায় যে, আজকাল এ প্রদেশে সাংখ্যদর্শন যত্নের সহিত অধীত বা উপদিষ্ট হয় না॥—ডাক্তার ব্যাল্যান্টাইনের The Sankhya Aphorisms of Kapila গ্রন্থে উপরোক্ত ভাষ্য উদ্ধৃত থাকিলেও তিনি গুণকে quality বলিয়া অনুবাদ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইউরোপীয় পণ্ডিতদের হস্তেও সংস্কৃত শাস্ত্রের মধ্যে মধ্যে এমনি দুর্দ্দশা ঘটে!

এই ভ্রমের সংসৃষ্ট অপর একটি ভ্রান্তি দেখা যায়; তদনুসারে প্রকৃতি জাতিবাচক শব্দ না বলিয়া ব্যক্তিবাচক শব্দ বলিয়া পরিগৃহীত। অনেকে ভাবেন প্রকৃতি "এক" অর্থাৎ একটি জিনিষ। এ ভ্রম যে, কেবল আধুনিক পাঠকবর্গের তাহা নহে—অনেক প্রাচীন পণ্ডিতেও এই ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন।—সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীর প্রারম্ভেই প্রকৃতির বর্ণনা এইরূপ—

"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং নমাম।"

—অসাবধান পাঠকে হঠাৎ ঈদৃশ ভাষাতে প্রকৃতিকে একটি দ্রব্য বলিয়া ভ্রান্ত হয়। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, সত্ত্ব রজস্ তমস্ যদি তিনটি দ্রব্য হয়—তবে প্রকৃতি কদাচ একটি মূল দ্রব্য হইতে পারে না।

"সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ"

—এই সূত্রে দেখা যায় যে, সত্ত্ব রজস্ ও তমস্ নামক দ্রব্যত্রয়ের অবস্থাবিশেষের নাম প্রকৃতি। এই অবস্থা "সাম্যাবস্থা" বলিয়া

সূত্রে বর্ণিত। আমি এই "সাম্যাবস্থা" সম্বন্ধে পূর্ব্বে দুই এক কথা বলিয়াছি। উপরে যে ভাষ্য প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে সাম্যাবস্থা অর্থাৎ অনূ্যনাতিরিক্তাবস্থা। ইহা বড় পরিষ্কার নহে। ভাষ্যকার অর্থ পরিষ্কার করিতে গিয়া লেখেন।—

"অকার্য্যাবস্থা ইত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ সত্ত্বাদি দ্রব্যত্রয় যখন কার্য্যে পরিণত না হয়—অর্থাৎ অন্য কোন পদার্থ উৎপাদন না করে—তখন তাহাদের যে অবস্থা তাহার নাম প্রকৃতি!—যদি জিজ্ঞাসা কর সে অবস্থা কি?—উত্তর—"অব্যক্ত"=জানি না!!! সাম্যাবস্থা কি তাহা আমরা আদৌ পরিজ্ঞাত নহি। ইহা একটি দার্শনিক কল্পনা বা theory মাত্র। সত্ত্বাদি দ্রব্যত্রয় পুরুষের যে অবস্থান্তর সাধন করে—তাহা তাহাদের কার্য্য। তদবস্থায় তাহারা পরিজ্ঞাত। এবং সেই অবস্থা ন্যূনাতিরিক্ত অবস্থা। ন্যূন=কেন না কার্য্যটি ঠিক কারণ নহে। উত্তাপ একপ্রকার জ্ঞান বা আত্মার অবস্থান্তর। উহা কার্য্য;—যাহা উহার ভৌতিক কারণ মনে কর তাহার নাম "সত্ত্ব"। সত্ত্বের সহিত উত্তাপের কোন সাদৃশ্য নাই। সত্ত্বকে উত্তাপ বলিয়া ধরিলে ন্যূনতা ঘটে। অতিরিক্ত—কেন না উত্তাপ —"সত্ত্ব" হইতে বিভিন্ন পুরুষের ভাবান্তর মাত্র। ইহাতে অতিরিক্ত পুরুষ নামক দ্রব্যের আভাস আছে। অতএব সত্ত্বের কার্য্য যে উত্তাপ তাহা সত্ত্বের ন্যূনাতিরিক্ত অবস্থা। মনে কর সত্ত্ব কোনও কার্য্য করিতেছে না, তৎকালে সত্ত্বের যে অবস্থা তাহারই নাম প্রকৃতি। রজস্ তমসেরও তাদৃশ অবস্থার নাম প্রকৃতি।

ইহাতে স্থূলমর্ম্ম এই দেখা যায়। জড়জগতে যাহা নিত্য পদার্থ তাহা তিন প্রকার সত্ত্ব রজস্ তমস্। অথবা "ক"—"খ"—"গ"। ইহারা "অন্যোঽন্যাভিব-আশ্রয়-জনন-মিথুনবৃত্তয়ঃ।"

অর্থাৎ পরস্পরকে অভিভূত করিয়া—কিম্বা আশ্রয় করিয়া—জনন ও মিথুনবৃত্তিযুক্ত হয়। রাসায়নিক সংযোগের নাম অভিভব (chemical combination); সন্নিকর্ষ সংযোগের নাম আশ্রয় (mechanical combination)। অভিভবের ফলে নূতন দ্রব্যের উৎপত্তি (জনন); আশ্রয়ের ফলে মিশ্রদ্রব্যের উৎপত্তি (মিথুন)। ইহা ক-খ-গএর একপ্রকার কার্য্য। এদিকে আধ্যাত্মিক জগতে "পুরুষ"নামক বহুসংখ্যক নিত্যপদার্থ বিদ্যমান। তাহাদিগকে "শ" "ষ" "স" বল। মনে কর "শ"=কুক্কুর; "ষ"=শৃগাল; "স"=ব্যাঘ্র। "শ"এর উপর "ক"এর ক্রিয়াতে কুক্কুরের সূর্য্যদর্শন; "ষ"এর উপর "ক"এর ক্রিয়াতে শৃগালের সূর্য্যদর্শন; "স"এর উপর "ক" এর ক্রিয়াতে ব্যাঘ্রের সূর্য্যদর্শন। এখানে "ক"এর ত্রিবিধ আত্মার উপর ত্রিবিধ ক্রিয়া বা কার্য্য দেখা যাইতেছে। ইহা আর এক প্রকার কার্য্য।

ক—খ—গএর অভিভবে ও আশ্রয়ে যে দ্রব্যান্তর প্রাদুর্ভূত হয়—বিবিধ শ্রেণীর আত্মার উপর তাহাদেরও তাদৃশ কার্য্য উৎপন্ন হয়।

সত্ব রজস্ তমস্ এবং তাহাদের অন্যোহন্যাভিভবাশ্রয়জন্য দ্রব্যসংঘ যখন এই শেষোক্তরূপে পুরুষসংঘের জ্ঞানোৎপাদক হইয়া কার্য্যের জনক হয় তখনই তাহারা দর্শনশাস্ত্রের সীমায় পৌঁছে। যাহা তাহাদের সাম্যাবস্থা বা অকার্য্যাবস্থা—তাহা দর্শনশাস্ত্রের অতীত একটি কল্পনামাত্র। তাহাই সাংখ্যদর্শনের অব্যক্ত প্রকৃতি !!! তাহারা অন্যোহন্যকে অভিভূত বা আশ্রয় না করিয়া কোনও কালে অকার্য্যকর অবস্থায় থাকে কি না—বা থাকিতে পারে কি না—তাহার উত্তর দর্শনশাস্ত্র দিতে অক্ষম।

"কার্য্যভিন্নং গুণত্রয়ং প্রকৃতিঃ।"

—ইহা কেবল কথার কথা কি বাস্তব অবস্থা তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে বিজ্ঞানশাস্ত্রে ঐরূপ একটা কথা থাকা অত্যাবশ্যক।—

---

# জয়দেব।

সকল জিনিষেরই এমন এক একটি কেন্দ্রস্থল আছে যেখান হইতে না দেখিলে তাহাকে কিছুতেই সম্পূর্ণরূপে ও সমগ্রভাবে দেখা হয় না। এবং তাহার ভিন্ন ভিন্ন একদেশ মাত্র দেখিয়া বিভিন্ন ব্যক্তির মনে তৎসম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা জন্মিয়া থাকে।

ন্যায়শাস্ত্রের একটি উদাহরণে এই তত্ত্বটি অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। কতকগুলি অন্ধ স্পর্শদ্বারা একবার হস্তীর আকার নির্ণয় করিয়াছিল। যে অন্ধ হস্তীর পাদস্পর্শ করিল, সে হস্তীকে স্তম্ভাকার বলিয়া বর্ণনা করিল। যে শুণ্ড স্পর্শ করিল, সে বলিল, না, এ ত স্তম্ভ নয়, এ যে সর্পাকার দেখিতেছি। যে ব্যক্তি দৈবক্রমে হস্তীর কর্ণ স্পর্শ করিয়াছিল, সে উভয়কেই মিথ্যাবাদী ঠাহরাইয়া হস্তীকে কুলার মত বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিল। এইরূপে হস্তীর আকার লইয়া অন্ধে অন্ধে যখন তুমুল কলহ বাধিয়াছে, এক চক্ষুষ্মান্ ব্রাহ্মণ আসিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, বাপুসকল, তোমরা কেহই মিথ্যা বল নাই, কিন্তু হস্তীর এক এক অঙ্গমাত্র স্পর্শ করিয়া তাহাকে তদনুরূপ বর্ণনা করিয়াছ। তোমাদের সকলের বর্ণনা মিলাইয়া লইলে একটি সমগ্র হস্তীর বর্ণনা করা হয়।

হস্তী সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ যে কথা বলিয়াছিলেন, প্রেম সম্বন্ধেও সে

কথা খাটে। প্রেমের স্বরূপ সমগ্রভাবে না দেখিয়া অনেকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখেন। সেই জন্য কেহ বা বলেন, শারীরিক সম্ভোগেই প্রেমের পর্য্যবসান। কেহ বলেন, ইহা সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার এবং যোগীজনসুলভ ধ্যানমাত্রাবলম্বী। কেহ বলেন, ইহা ইন্দ্রিয়জ প্রবৃত্তিমাত্র। কেহ বলেন, ইহা এক অতীন্দ্রিয় মনোজ ভাব। কিন্তু যে কেন্দ্রভূমি হইতে দৃষ্টিপাত করিলে এই শরীর মন, সম্ভোগ এবং প্রীতি, আলিঙ্গন এবং ধ্যান একটি সমগ্র সত্তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে প্রতিভাত হয়, সে কেন্দ্রভূমিতে এই সকল ভিন্নমতাবলম্বী বিরোধীবর্গের কেহই উপনীত হয়েন নাই।

সেখান হইতে যেরূপ প্রতিভাত হয়, একজন ইংরাজ কবি—শ্রীমতী এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং—"Inclusions" নামক একটি ক্ষুদ্র কবিতায় তাহা অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন।

"Oh, wilt thou have my hand, Dear, to lie along in thine ?
As a little stone in a runing stream, it seems to lie and pine.
Now drop the poor pale hand, Dear, unfit to plight with thine.

Oh, wilt thou have my cheek, Dear, drawn closer to thine own ?
My cheek is white, my cheek is worn, by many a tear run down.
Now leave a little space, Dear, lest it should wet thine own.

Oh, must thou have my soul, Dear, commingled with thy soul?
Red grows the cheek, and warm the hand; the part is in the whole:
Nor hands nor cheeks keep separate, when soul is joined to soul." *

যখন হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন হয়, তখন শরীর দূরে পড়িয়া রহে না; তখন স্বতই বাহু বাহুর নিকটে আকৃষ্ট হয়, কপোল কপোলে আসিয়া সংলগ্ন হইতে চাহে। দেহ মন আত্মা একত্র হইয়া জমাট্ বাঁধিয়া গিয়াছে। ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে সম্ভোগ করিতে গেলে প্রেমকে সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। প্রেমের মধ্যে এই সকলই অত্যন্ত অবিচ্ছেদ্য ভাবে একীকৃত হইয়াছে।

এখন, যে কবি তাঁহার কাব্যে প্রেমকে তাহার এই স্বাভাবিক অখণ্ড মহিমায় যেরূপ ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, সেই অনুসারে তাঁহার কাব্যের গৌরব। যিনি প্রেমকে কেবলমাত্র শারীরিক

* হে প্রিয়তম, আমার এই হাতখানি কি তোমার ঐ হাতের উপরে ফেলিয়া রাখিতে চাও? এই দেখ, স্রোতের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র উপলখণ্ডের মত আমার এই করতল মুহ্যমানভাবে পড়িয়া আছে, এই ক্ষীণ পাণ্ডুবর্ণ হস্ত তুমি পরিত্যাগ কর প্রিয়তম, এ তোমার সহিত সম্মিলিত হইবার যোগ্য নহে।

হে প্রিয়তম, আমার এই কপোল কি তোমার কপোলের নিকটে আকর্ষণ করিতে চাও? দেখ, আমার বিবর্ণ কপোল অশ্রুজলধারায় ক্ষীয়মান—মধ্যে ব্যবধান রাখিয়া দাও প্রিয়তম, নহিলে অশ্রুজলে তোমার কপোলও সিক্ত করিয়া দিবে।

হে প্রিয়তম, আমার এই হৃদয় কি তোমার হৃদয়ের সহিত এক করিতে চাও? আমার বিবর্ণ কপোল রক্তিম হইয়া উঠিল, আমার অসাড় হস্তে জীবনের উত্তাপ সঞ্চারিত হইল। সমগ্রের মধ্যেই অংশ আছে; করতলের সহিত করতল, এবং কপোলের সহিত কপোল বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না, যখন হৃদয়ের সহিত হৃদয় সংযুক্ত হয়।

শৃঙ্গারসম্ভোগে অভিব্যক্ত করেন, তাহার সহিত অন্তরের কোন-প্রকার সম্বন্ধ রাখেন না, তাঁহার মহত্ত্ব নাই—তিনি এমন একটি সীমাবদ্ধ ব্যাপারের মধ্যে তাঁহার কাব্যকে স্থাপন করেন যেখানে অক্লান্ত আনন্দ সম্ভোগের স্থান নাই, যেখানে মানবহৃদয়ের তৃপ্তি অতি শীঘ্রই নিঃশেষ হইয়া যায়। যে কবি শরীরের উপরে প্রেমের প্রতিষ্ঠা না করিয়া তাহাকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁহারই কাব্যে সম্ভোগের প্রসর অনন্ত বিস্তৃত। কান টানিলে যেরূপ মাথা আসিয়া পড়ে, অন্তরের প্রেম সেইরূপ মনের সহিত সমস্ত শরীরকেও টানিয়া আনে, এবং সেই সঙ্গে শরীর মনের অতীত এক অপরিসীম আনন্দলোকের অপরূপ সৌন্দর্য্যজ্যোতি দীপ্যমান হইয়া উঠে। কিন্তু যাঁহারা শরীরকে হেয়জ্ঞানপূর্ব্বক পূর্ব্ব হইতেই মনকে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া প্রেমকে ধ্যানমাত্রে অভিব্যক্ত করিতে চাহেন, তাঁহাদের সে প্রেম আকারবিহীন নিষ্ফল। কারণ, প্রেমের ধর্ম্মই এই যে, সে প্রিয়জনকে দর্শন করিতে চাহে, স্পর্শ করিতে চাহে, তাহার কাছাকাছি থাকিতে পারিলে সুখানুভব করে। বাস্তবিক, ভাবিয়া দেখিতে গেলে, শরীরমাত্রগত সম্ভোগ ও দর্শনস্পর্শনাকাঙ্ক্ষাহীন অতিসূক্ষ্ম ধ্যানমাত্রগত সম্ভোগ—মৃতদেহ ও প্রেতাত্মা—উভয়ই স্বতন্ত্রভাবে মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত করিতে অক্ষম। জীবন্ত মানবই—আত্মাধিষ্ঠিত দেহই—মানবের শরীর মন আত্মাকে সমগ্রভাবে আকর্ষণ করিয়া মনুষ্যত্বকে সফল করিতে পারে।

এই সর্ব্বাঙ্গীন পরিপূর্ণ প্রেমের বিস্তৃতি ও প্রগাঢ়তানুসারেই আমরা প্রেমসাহিত্যে গীতগোবিন্দের স্থান নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিব। এইটুকু দেখিলেই হইবে যে, গীতগোবিন্দে অঙ্গে অঙ্গে যে মদনতরঙ্গ উঠিয়াছে তাহার পরিতৃপ্তি কোথায়।

অঙ্গের সম্বন্ধ আছে বলিয়া পাঠকেরা বিচলিত হইবেন না। মনের সহিত এই দেহও দেবতারই দান। এবং প্রেমের পুণ্য হোমাগ্নিতে মন ও বাক্যের সহিত শরীরও চিরদিন আহুতি প্রদত্ত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইন্ধনে যেমন হোমাগ্নি সংরক্ষিত হইলেও সেই অগ্নিশিখা দেবতার উদ্দেশে উত্থিত হয় বলিয়াই তাহার গৌরব, প্রেমাগ্নিও সেইরূপ অঙ্গে অঙ্গে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়া যে অন্তরতম গভীরতম পুণ্য আকাঙ্ক্ষার দিকে নির্দ্দেশ করে তাহাতেই তাহার এত মাহাত্ম্য।

দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে বিদ্যাপতির কবিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিদ্যাপতির কবিতা নব্য রুচি অনুসারে সর্ব্বত্র যে খুব শ্লীল তাহা বলা যায় না। এবং তাঁহার কাব্যে শরীরের প্রতি শরীরের আকর্ষণ যথেষ্ট সূচিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিদ্যাপতির কবিতার স্থান বহু উচ্চে। কারণ এই যে, তাঁহার কবিতায় শরীর শরীরের সহিত মিলিত হইয়া সেই প্রেম-কেই চরিতার্থ করিবার প্রয়াস পাইয়াছে, যে প্রেম যতই প্রগাঢ় হয় ততই অপরিতৃপ্ত এবং ততই তাহার সম্ভোগানন্দ।

"সখিরে, কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।
জনম অবধি হম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনমু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।
কত মধু-যামিনী রভসে গোয়ায়নু,
না বুঝনু কৈছন কেল।

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।
যত যত রসিক জন রস অনুগমন,
অনুভব কহে, না পেখে,
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল একে।"

এখানে কেবলমাত্র প্রেমের শীতল ইন্ধন সংগৃহীত হয় নাই, কিন্তু সেই দীপ্ত অগ্নিশিখা বহু উর্দ্ধে উঠিয়া চতুর্দ্দিকে আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। শুদ্ধ শরীরমাত্র সম্ভোগ হইলে অনুরাগ তিলে তিলে এমন নূতন হইয়া উঠিত না, প্রতি মুহূর্ত্তে ম্লান ও জীর্ণ হইয়া পড়িত। রূপ দেখিতে দেখিতে নয়ন তৃপ্ত হইয়া আসিত, কথা শুনিতে শুনিতে শ্রবণ অসাড় হইয়া পড়িত, হৃদয় হৃদয়ের উপরে ভার বোধ হইত, এবং কেলি ক্লান্তিতে পরিণত হইতে বিলম্ব হইত না। শ্রান্তি শরীরের ধর্ম্ম। কিন্তু অন্তরের প্রেম এ ক্ষণিক সম্ভোগমাত্র নহে। অন্তরও রূপ দেখে, কিন্তু দেখিতে দেখিতে অবসন্ন হইয়া পড়ে না। লক্ষ লক্ষ যুগ ধরিয়া প্রিয়জনকে হৃদয়ে রাখিয়াও তাহার পরিতৃপ্তি নাই। সে প্রগাঢ় প্রেম কেলিকলামাত্রে চরিতার্থ হয় না; সে যতই পায় ততই চায় এবং প্রিয়জনকে প্রাণপণে যতই বক্ষে চাপিয়া ধরে কিছুতেই মনের মত করিয়া পায় না।

জয়দেবে এই চির-অতৃপ্ত প্রগাঢ়তা কোথাও চোখে পড়ে না। গীতগোবিন্দ পাঠান্তে মনে হয়, ন্যায়শাস্ত্রবর্ণিত অন্ধের ন্যায় প্রেমের বিপুল বহুল বহিরঙ্গেই জয়দেব হাত বুলাইয়া গিয়াছেন; তিনি খণ্ড খণ্ড সম্ভোগে প্রেমকে বিক্ষিপ্তভাবে দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন, অন্তরের অসীমতার দ্বারে খুলি-

স্তূপ উচ্চ করিয়া দ্বাররোধ করিয়াছেন, সে ধূলি পুষ্পরেণুর ন্যায় সুগন্ধ হইতে পারে, স্বর্ণরেণুর ন্যায় সুন্দর হইতে পারে তথাপি তাহা উচ্চতর সৌন্দর্য্যরাজ্যের পথে বাধাস্বরূপ।

এই সহজপরিতৃপ্ত সঙ্কীর্ণ সম্ভোগবিলাস কতকগুলি চির-প্রচলিত শরীরসম্বন্ধীয় উপমাসন্নদ্ধ হইয়া এক মেরুদণ্ডবিহীন ললিত গলিত ছন্দের উপর ভর করিয়া নিতান্ত পিচ্ছিল কোমল পদাবলীর উপর দিয়া স্খলিত ও লুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

ছন্দও যেমন পিচ্ছিল, জয়দেবের সুন্দরীগণের যৌবনসন্নদ্ধ অঙ্গসমূহ তদপেক্ষা অধিক পিচ্ছিল, এবং এই সুদীর্ঘ শৃঙ্গারকলুষ বর্ণনায় পাঠকের মনে সে সৌন্দর্য্যও সামান্যমাত্রও বসে না। শ্লোকের পর শ্লোক ধারাবাহিক সমভাবাপন্ন শৃঙ্গার-প্রতিধ্বনি মাত্র; এবং এই শ্লোকশ্রেণীর মধ্য দিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতে পাঠকের মনে শ্রান্তি ও তদানুষঙ্গিক বিরক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়।

কিন্তু এই শৃঙ্গারসম্ভোগই গীতগোবিন্দের দেহ অথবা প্রাণ যাহা বল। এবং সমালোচকেরা ইহাতেই জয়দেবের গৌরব প্রতিষ্ঠা করেন। কারণ, ইহা জীবাত্মা ও পরমাত্মার অনির্ব্বচনীয় আধ্যাত্মিক মিলনেরই শরীরী রূপক। এবং জয়দেব নিজেই বলিয়াছেন যে, যদি হরিস্মরণে মন সরস হয় তবে এই জয়দেব-সরস্বতী শ্রবণ কর।

সুতরাং শারীরিক সম্ভোগেরই বর্ণনা বলিয়া গীতগোবিন্দকে নিকৃষ্ট শ্রেণীর কাব্য বলা যায় না। কবি যদি সেই ঈশ্বরের ভাবে তন্ময় হইয়া সাধারণ সম্ভোগের ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাতে এমনই কি দোষ হইয়াছে? হাফেজ ত বারবার মদিরা-পানের কথা বলিয়াছেন এবং মর্ত্ত্য বিরহের ভাষাতেই প্রিয়জনের

জন্য বিলাপ করিয়াছেন। তাঁহাকে ত কেহ সে জন্য অপরাধী করে না।

বাস্তবিক, ভাবুকের অন্তরে এমন একটি স্থান আছে যেখানে আসিয়া মনুষ্যত্বের সহিত দেবত্বের মিলন সংঘটিত হয়। এবং সেই সঙ্গমক্ষেত্রের ভাষা মানবকবির রচনায় কতকটা এই মর্ত্ত্য প্রেম ও সম্ভোগের ভাষারই অনুরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে কোনরূপ কলঙ্ক স্পর্শ করে না—কেবল হৃদয়ের একটি নিবিড় প্রগাঢ়তা ব্যক্ত হয়, যে তন্ময়ী প্রগাঢ়তা এই মর্ত্ত্যধামে দম্পতির শরীর মনের ব্যবধান ঘুচাইয়া দেয় এবং হৃদয় হৃদয়ে ও সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বাঙ্গের আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করে।

কেবলি যে,দাম্পত্য প্রেমেই জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ ব্যক্ত হয় এমনও নহে। সকল প্রেমই যাঁহা হইতে নিঃসৃত সেই প্রেম-স্বরূপকে প্রেমের যে কোন ভাবে উপলব্ধি কর তিনি তাহাতেই প্রকাশমান। রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে মাতৃভাবে দেখিয়া তাঁহার সহিত পুত্রের ন্যায় আচরণ করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গীতে এই মাতাপুত্রভাব মর্ত্ত্য মাতাপুত্রেরই ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্ম ঈশ্বরকে নানা ভাবে দেখিয়াছে। এবং বৈষ্ণব সঙ্গীতে মানব ভাবই প্রগাঢ় হইয়া সেই সেই ভাব ব্যক্ত করিয়াছে। এই যে রাধাকৃষ্ণের রূপক ইহা ত সেই বৈষ্ণব ধর্ম্মেরই অঙ্গ। বৈষ্ণব জয়দেব গোস্বামী যদি ইহা লইয়া কাব্য রচনা করেন, তাহাতে ঈশ্বরতন্ময়তার পরিবর্ত্তে শরীরতন্ময়তাই প্রকাশ পাইবে কেন?

কারণ এই যে, জয়দেব ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া গীতগোবিন্দ রচনা করেন নাই। হরিকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়ত তাঁহার লক্ষ্য ছিল কিন্তু বিলাসকলায় কুতূহল উদ্রেক করিয়া দেওয়া

তদপেক্ষা গৌণ উদ্দেশ্য ছিল না। আধ্যাত্মিক সমালোচকেরা স্বপক্ষে যে শ্লোকের কিয়দংশমাত্র উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, সেই শ্লোকটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দিলেই পাঠকেরা ইহার প্রমাণ পাইবেন।

"যদি হরিস্মরণে সরসং মনো যদি বিলাসকলাসু কুতূহলং।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীং।"

সুতরাং জয়দেব যে, হরিস্মরণ এবং বিলাসকলা উভয় দিকেই দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দুর্ব্বল মানবহৃদয় এরূপ সঙ্কটস্থলে হরিস্মরণ অপেক্ষা বিলাসকলার দিকেই সাধরণতঃ কিছু আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এবং গীতগোবিন্দের কবিও এই মানবস্বভাবসুলভ দুর্ব্বলতা অতিক্রম করিতে পারেন নাই বলিয়া আশঙ্কা হয়।

তিনি রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে সেই যে কুঞ্জপ্রবেশ করিয়াছেন তদবধি এই বিলাসকলাই রচনা করিতেছেন। এবং তাঁহার কাব্যে আদিরসের সমস্ত বাহ্য উপকরণই সংগৃহীত হইয়াছে, কেবল কবির যে আত্মবিস্মৃতিটুকু থাকিলে এই সমস্ত বিলাসকলাও সরল ভাবে নিষ্কলঙ্ক হইয়া উঠিত তাহাই নাই।

এই অতি সচেতন বিলাসিতাই জয়দেবের শ্রীহানি করিয়াছে। শৃঙ্গার রসও নহে, সম্ভোগবর্ণনাও নহে, মদনতরঙ্গও নহে, মানবদেহও নহে।—প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে নব্য রুচির বিরুদ্ধ ভাষায় এমন অনেক কথা স্পষ্ট করিয়াই উল্লেখ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঋগ্বেদের পুরুরবা ও উর্ব্বশী উপাখ্যানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। † ঋগ্বেদের এই নগ্ন বর্ণনায় শ্লীলতা অশ্লীলতা রুচি অরুচি শরীর মন এ সমস্ত অতিসূক্ষ্ম ভেদাভেদ লুপ্ত হইয়া গিয়া হৃদয়ের সহজ

† ৮ অষ্টক, ৫ অধ্যায়, ১০ মণ্ডল, ৯৫ সূক্ত।

স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসে এমন একটি দীপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে যাহাতে সমস্ত পাপ, সমস্ত অবিশুদ্ধি নিমেষে ভস্মীভূত হইয়া যায়।

জয়দেবে এই সহজ স্বাভাবিকতাটুকু নাই। সম্ভোগবর্ণনা তাঁহার হৃদয় হইতে সহজ আবেগভরে বাধা বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে নাই, বিলাস উদ্রেক মানসে ইঙ্গিতে ইসারায় নানা ছলে তিনি সমস্ত বর্ণনার মধ্যে অনেকখানি গরল সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। এই নাগরিকতা, এই ঠারই সর্ব্বাপেক্ষা জঘন্য।

নহিলে, মানবের শরীরও হেয় নহে, উলঙ্গতাও অপবিত্র নহে। উলঙ্গ যোগীকে দেখিয়া কেহ ত সঙ্কোচ অনুভব করে না। বরঞ্চ সেই নগ্ন দেহই পুণ্যদর্শন বলিয়া গণ্য হয়। উলঙ্গ শিশু কাহারও চক্ষে অপবিত্র নহে! এবং বন্য মানবের উলঙ্গতাও অশোভন বলিয়া গণ্য হয় না। কারণ আর কিছুই নহে, ইহার মধ্যে কোনরূপ ঠার নাই, ইঙ্গিত ইসারা নাই, নাগরিকতা নাই।

গ্রীসীয় নগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিয়া কেহ ত অশ্লীল বলে না। প্রকৃতির অন্তর হইতে সেই নগ্ন গঠন যেন স্বভাবতই অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাহার আবরণ নিষ্প্রয়োজন। আবরণের কথা সেখানে মনেই আসে না।

কিন্তু এই গ্রীসীয় প্রস্তরমূর্ত্তির পার্শ্বে ফরাসী চিত্রশালার এক-খানি নগ্নদেহ চিত্র স্থাপিত কর, সে অকুণ্ঠিত সম্ভ্রম নাই, সে দীপ্ত গৌরব নাই। ফরাসী চিত্রকর ঐ নারীমূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গ হইতে বসন স্খলিত করিয়া দিয়া পায়ে হয়ত জুতা রাখিয়াছেন, কিম্বা এমন করিয়া এমন কিছু রাখিয়াছেন যাহাতে এই বর্ত্তমান শতাব্দীর বসনভূষণের একটি ভাব মনে করাইয়া দেয় এবং এই বিবসনতার মধ্যে একটা সচেতন উদ্দেশ্য নির্দ্দেশ করে।

বৈদিক পুরুরবা ও উর্ব্বশী চিত্রের পার্শ্বে জয়দেবের সম্ভোগ-চিত্রাবলী এইরূপ। এবং হরিস্মরণ ত দূরের কথা, মনুষ্যত্বেরও বিকাশ এখানে অত্যন্ত সঙ্কুচিত। এই গীতগোবিন্দে গীত থাকিতে পারে, কিন্তু গোবিন্দ আছেন কিনা আমাদের সম্পূর্ণ সন্দেহ আছে।

---

# স্বরলিপি।

রাগিণী হাম্বীর-কেদারা—তাল কাওয়ালি।

সখি, আমারি দুয়ারে কেন আসিল,
নিশিভোরে, যোগী ভিখারী,
কেন করুণস্বরে বীণা বাজিল।
আমি আসি যাই যতবার, চোখে পড়ে মুখ তার,
তারে ডাকিব কি ফিরাইব তাই ভাবিলো।
শ্রাবণে আঁধার দিশি, শরতে বিমল নিশি,
বসন্তে দখিন বায়ু, বিকশিত উপবন
কত ভাবে কত গীতি গাহিতেছে নিতি নিতি,
মন নাহি লাগে কাজে আঁখি জলে ভাসিলো।

ধনা॥ নর্র্ সা। নধা পঃ -ক্ষপঃ। পধা -া। -া -গমা।
সখি॥ আ মা। রি দু —। য়া —। — —।

। নধা -া। -ধঞা ধপা। ক্ষা পক্ষধা। পধপক্ষা -পা।
। রে —। — কেন। আ সি। ল —।

। -া রগা । মগপা মা । -মগা রগা । মা -মগা । রসা ন্‌রা ।
। —নিশি । ভো রে। — ঘো । গী — । ভি খা ।

। সা সসা। সসা মা। মগা পা। পক্ষা ধা। -া -া ।
। রী, কেন। করু ণ । স্ব রে। বী ণা। — — ।

। ধনা র্সর্রা। র্সনা ধনা॥ পক্ষা ধা। মগা পা। পক্ষা ধা।
। বা জি । ল সখি॥ আ মি। আ সি। যা ই ।

। ধপা র্সা। নর্রা -র্সা। -া -া । নর্সা নর্সা। ধনা সা।
। য ত। বা —। — র্‌। চো খে । প ড়ে।

। র্সা নধা। ধনা -ধা। -পক্ষা -পা। -া পপা। পা ক্ষপধা।
। মু খ । তা —। — —। র্‌ তারে। ডা কি ।

। পা মা। মগা গমা। রা সা। -া -া। সা -মা।
। ব, কি। ফি রা। ই ব। — —। তা —।

। -মগা -পা। -া -া। ধনা র্সনর্রা। র্সনা ধনা॥ সা র্সা।
। — —। — ই। ভা বি । লো সখি॥ শ্রা ব।

। মা মা । মগা পক্ষা। পা পা। পক্ষা পা। ক্ষপনা ধা।
। ণে, আঁ। ধা র । নি শি। শ র । তে, বি।

। পা মা। মগা মা। মগা মা। গমধা পা। মা মগমা।
। ম ল । নি শি। ব স । ন্তে, দ । খি ন ।

। র্‌া সা। সা মা। [ম]গা পা। পহ্মা ধা। পহ্মা পা।
। বা য়ু। বি ক। শি ত। উ প। ব ন।

। পা ধা। [ধ]পা র্সা। র্সনা র্রা। র্সনা র্সা। র্সা নর্সর্গা।
। ক ত। ভা বে। ক ত। গী তি। গা হি ।

। র্রা র্সনা। ধনা র্সা। নধা পা। পহ্মা পা। হ্মপধা পা।
। তে ছে। নি তি। নি তি। ম ন। না হি।

। মগা [গ]মা। র্‌া সা। -া -া। সা মা। [ম]গা পা।
। লা গে। কা জে। — —। আঁ খি। জ লে।

। -া -া। ধনা র্সনর্রা। [র্]র্সনা ধনা ॥ ॥
। — —। ভা সি। লো সখি ॥ ॥

## ব্যাখ্যা।

১। এই গানটি ফাঁক হইতে আরম্ভ হয়। কাওয়ালী তালে দ্বিতীয় তালে সম পড়ে। সম বুঝাইবার জন্য ২ সংখ্যার মাথায় রেফ্ দেওয়া হইয়াছে। অন্তরা আভোগ প্রভৃতি সম হইতে আরম্ভ হয়। আস্থায়ীর কয়েক পদে ও অন্তরা প্রভৃতির আরম্ভে তাল চিহ্নিত করা হইয়াছে। বাকী তাল এই অনু-সারে বুঝিয়া লইতে হইবে।

২। ঃ বিসর্গ অর্দ্ধমাত্রার চিহ্ন।

৩। যে স্বর ঈষৎ ছুঁইয়া যায় তাহাকে স্পর্শ-মাত্রা কহে—এই স্পর্শমাত্রা বুঝাইবার জন্য সেই স্বরাক্ষর ক্ষুদ্র অক্ষরে শিরোভাগে লিখিত হয়।

৪। হ্ম=কড়ি মা; ঞ=কোমল নি।

৫। অন্তরা প্রভৃতির শেষে যেখানে যুগল ছেদ দেখিবে সেখান হইতে ফিরিয়া আস্থায়ীতে যাইতে হইবে। আস্থায়ীর যেখানে যুগল ছেদ আছে সেই-

থান হইতে ধরিবে। যেখানে একেবারে থামিতে হইবে তাহার শিরোদেশে যুগল ছেদ বসে।

৬। "যোগী" এই কথার মধ্যে "গী" শব্দটী মধ্যমে দেড় মাত্রা কাল স্থায়ী। যথা, মাঃ গঃ;

গী –

অর্দ্ধমাত্রা বারম্বার ব্যবহার না করিয়া আমরা এই স্থলে এইরূপ লিখিলাম। যথা, মা—মগা।

গী –

গাহিবার সময় দ্বিতীয় 'মা' পুনরুচ্চারণ না করিয়া প্রথমটি দেড় মাত্রা কাল টানিয়া রাখিতে হইবে।

---

# কৃতজ্ঞতা।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বড় তরফের আমলা কয়লার অধিকাংশ জেলার সদরে ম্যানেজারের কর্তৃত্বাধীনে থাকিত। স্বয়ং কর্ত্রী হরিপ্রিয়া ঠাকুরাণী নাবালক ছেলে দীনেন্দ্রনাথ এবং একপাল কুপোষ্য লইয়া কুণ্ডলার বৃহৎ বাটীতে বিরাজ করিতেন। দেখিতে দেখিতে এই রূপে পাঁচ বছর কাটিয়া গেল। কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের অনুষ্ঠানের ত্রুটি নাই—নাবালকের শিক্ষাদির জন্য দিব্য বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু সবেমাত্র নয় বছরে পদার্পণ করিয়া সেবারে দীনেন্দ্রনাথ যখন কালেক্টর সাহেবের তাঁবুতে হাজিরি দিতে গেল, তখন দেখা গেল যে, সে নিজের নামটাও ভাল করিয়া বানান করিতে শেখে নাই। ইহাতে তাহার বি, এ, পাস-করা মাষ্টার এবং নর্ম্মাল স্কুলের শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ পণ্ডিত মহাশয়ের চাকরী

লইয়া টানাটানি পড়িয়া গেল। নাবালক ঘোড়ায় চড়িতে কেন শেখে নাই কলেক্টর ইহার কৈফিয়ৎ তলব করিলে ম্যানেজার সাফ জবাব দিলেন যে, কর্ত্রী ঠাকুরাণী তাহাকে কোন জানওয়ারের কাছে যাইতে দেন না। কলেক্টর ষ্টুয়ার্ট ইহাতে হাড়ে চটিয়া গেলেন এবং মাষ্টার পণ্ডিতকে ডাকাইয়া ছেলের উপযুক্ত তালিমের জন্য এক বৎসরের "মহলৎ" দিলেন। কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহারই অতিরিক্ত আদরে ছেলেটী মাটী হইতে বসিয়াছে। অতঃপর সেরূপ করিলে তিনি নাবালককে অন্তঃপুরের সংস্পর্শশূন্য করিবার জন্য কলিকাতার "ওয়ার্ডইনষ্টিটিউটে" পাঠাইতে বাধ্য হইবেন।

সাহেবের এই ধমকানি খাইয়া আর কেহ হইলে কি করিত বলা যায় না, কিন্তু কর্ত্রী শ্রীমতী হরিপ্রিয়া স্বহস্তে বিস্তর ক্ষীরপুলি এবং চন্দ্রপুলি তৈয়ার করিয়া ফেলিলেন। যথাকালে স্বর্ণ রৌপ্য থালে বহুমূল্যের কারুকার্য্যখচিত বস্ত্রমণ্ডিত হইয়া সেই মিষ্টান্নরাশি আসাসোটাধারী চোপদারমুখর বাহকগণের স্কন্ধে সাহেব-শিবিরে উপস্থিত হইল। সমেম সাহেব এই "ভেট্" কৃপা-কটাক্ষে দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আমলা চোপদার ফিরিয়া গিয়া কর্ত্রীকে জানাইয়া দিল, নিজহস্তে তিনি সকল জিনিস তৈয়ার করিয়াছেন শুনিয়া কলেক্টর বড় খুসী হইয়াছেন। অধিক কি, মেম সাহেব দেখিতে দেখিতে একখানা পার করিয়া দিলেন ইত্যাদি। এই রকম সত্য গল্প শুনিয়া হরিপ্রিয়ার এক দাশরথী রায়ের পাঁচালি-পড়া "মিতিন" সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে, সাহেবেরা রাক্ষসের জাতি।

মিষ্টান্নোপহার পাইয়া সাহেব ভুলুন আর না ভুলুন, কর্ত্রীঠাকুরাণী উপহার পাঠাইয়া কিন্তু ভারি খুসী হইলেন এবং স্থির